নন্দীগ্রাম ইতিবৃত্ত

শ্রীঅধরচন্দ্র ঘটক



মেদিনীপুর সংস্কৃতি পরিষদ
৩, রামকান্ত মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা—১২

অধ্যাপক শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, এম. এস. সি
মেদিনীপুর সংস্কৃতি পরিষদ
৩, রামকান্ত মিস্ত্রি লেন
কলিকাতা—১২

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৪

মুদ্রাকর :
শ্রীদুকড়ি দাস
গোপীনাথ আর্ট প্রেস
১৫, পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা—৯

—: প্রাপ্তিস্থান :—

নূতন বই ঘর
নন্দীগ্রাম, মেদিনীপুর

পোষ্ট গ্রাজুয়েট বুকমার্ট
৫৫, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা—৯

প্রাক্কথন

মেদিনীপুর জেলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অনুশীলনে এবং পরিবেশনে সংস্কৃতি পরিষদের যে কী ভূমিকা এর প্রকাশিত পুস্তকগুলির পরিচয়ে তা সহজেই বুঝতে পারা যাবে। এই পরিষদ স্থাপনের পর হতে পরম শ্রদ্ধেয় ডক্টর যদুনাথ সরকার, ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়, অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু প্রভৃতি মহোদয়গণের আশীর্বাদ আমাদিগকে হাজার বাধা-বিপত্তির মধ্যেও কাজ করবার প্রেরণা যুগিয়েছে। বলতে আমাদের কোন সংকোচ নাই যে আমাদের সভ্য সংখ্যা এখনও দশজনের বেশী নয় এবং আমাদের দুঃখ যে আমরা আমাদের জেলার তথাকথিত চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কোন পরামর্শ, বা সাহায্য পাইনি। যাঁরা বিদ্যাবত্তায় বা সঙ্গতিতে অনেক উচ্চে রয়েছেন তাঁদের উপদেশ, পরামর্শ ও পৃষ্ঠপোষকতা পেলে হয়ত এই প্রতিষ্ঠান আজ একটি প্রথম শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান হতে পারত।

ইতিহাসের গবেষণায় ও তথ্য পরিবেশনে যে সতর্কতা থাকা দরকার, যে সাহস দরকার তা সকলের থাকে না। সেইজন্য আঞ্চলিক ইতিহাসের পুস্তক অনেক সময় নানা অপ্রয়োজনীয় তথ্যে ভরে থাকে। বিশেষ ভাবে যদি সেটা সমসাময়িক কালের ইতিহাস হয়। আবার লেখকের যদি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি না থাকে অতি-প্রয়োজনীয় বাস্তব ঘটনা চিরকালের জন্য অতীতের অন্ধকারে থেকে যায়। রাত পোহালেই বর্তমানের ঘটনা হয় অতীতের কাহিনী। সে সকলের কখন হয়ত আসল রূপ উদ্ভাসিত হয়, কখন বা সে সকল সুবিচার পায়না। এই সুবিচার বা অবিচার নির্ভর করছে ভাবীকালের অনুসন্ধিৎসুদের গবেষণা ও তথ্য বিশ্লেষণের দৃষ্টি ভঙ্গীর উপর।

এমনি ভাঙ্গা-গড়ার টান। পোড়েনের মাঝ দিয়ে ব্যক্তি-মানুষের স্বকীয়তা, ঔদার্য, সমষ্টি-মানুষের কর্মচঞ্চলতা, রীতি-নীতি ও ধ্যানধারণা ইতিহাসের উপাদান রূপে স্বীকৃত হয়ে থাকে। অনেক সময় আবার তার স্বাক্ষর অত্যন্ত প্রত্যক্ষ রূপে দলিল-দস্তাবেজ-এর মধ্যে প্রতীত হয়, আবার কোথাও সে সব মূর্তি, মন্দির, মসজিদ, কিংবা লোক-গাথা বা কিংবদন্তীর মধ্যে প্রকাশ পায়। সে সবের সম্পূর্ণ মনন, বিশ্লেষণ ও সংযোজন যে কত কঠিন তা সহজে অনুমানকরা যায়। তবুও হাজার ত্রুটি বিচ্যুতি, দুর্বলতা ও অক্ষমতা নিয়ে নন্দীগ্রাম ইতিবৃত্ত রচনায় প্রয়াসী হয়েছি। বলা বাহুল্য আমাদের এই পরিষদ জেলার বিভিন্ন থানা ও অঞ্চলকে কেন্দ্র করে কয়েকটি ক্ষুদ্র বৃহৎ পুস্তক প্রণয়নের পরিকল্পনা অনেক আগেই নিয়েছে। এই হ'ল তার সেই চেষ্টার বহিঃপ্রকাশ।

বর্তমান গ্রন্থের লেখক শ্রীঅধরচন্দ্র ঘটক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাদের এই আবেদনে সাড়া দেন। লেখক সম্বন্ধে একটি কথা এখানে বলা দরকার এই জন্যে যে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিদ্যাবত্তার সার্টিফিকেট নাই। অতি সাধারণ দরিদ্র কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর পূর্ব পুরুষ প্রায় দুইশত বছর আগে নারায়ণগড় থানার কোন এক গ্রামে বাস করতেন। কোন অজ্ঞাত কারণে এই থানার আমদাবাদ গ্রামে এসে পরে বসবাস করেন। আগের দিনের গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় বিদ্যাভাস শেষ করে পনের বছর বয়সে তিনি নিজেই গুরুমশাই এর কাজ সুরু করেন। এর পর নিজে সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুশীলন করতে থাকেন। তাঁর কতক প্রবন্ধ ও কবিতা স্থানীয় পত্র পত্রিকায় বিশেষ ভাবে সাহিত্য সমাজ, দেশপ্রাণ, মেদিনীবাণী, প্রদীপ, পাঞ্চজন্য প্রভৃতিতে প্রকাশিত হয়েছে। এখনও তাঁর কয়েকটি পাণ্ডুলিপি রয়েছে সেগুলির মূল্য কম নয়।

পরিশেষে আমি একটা কথা বলতে চাই হয়ত কোন কোন সাধারণ ঘটনা বা কাহিনীর বর্ণনায় লেখক অনেকের নাম দিতে পেরেছেন, অনেকের নাম হয়ত তাঁর দৃষ্টি থেকে এড়িয়ে গেছে। যদি তাই হয়ে থাকে তবে সেটা আপাতদৃষ্টিতে ত্রুটি বলে মনে হবে। আমরা এ সম্পর্কে মতামত পেলে পরের সংস্করণে সংশোধন করে দিতে চেষ্টা করবো।

এছাড়া নন্দীগ্রামকে ঘিরে যে সকল কিংবদন্তী বা ছড়া রয়েছে সেগুলিও পবিষদের চেষ্টায় সংগৃহীত হয়েছে। সেগুলির পরিবেশন এই বইতে করা সম্ভব হল না। মেদিনীপুব জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসে সে সবের বিস্তৃত পর্যালোচনা থাকবে।

মেদিনীপুর জেলা সমাজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, জেলা গ্রন্থাগাবিক শ্রীমুরলী সেন ও বন্ধুবর শ্রী আজহাব খান পরিষদকে নানাভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছেন। এই জেলার অনেক পদস্থ কর্মকর্তা আমাদের এই প্রচেষ্টাকে নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন। তাঁদের সকলের কাছে আমরা ঋণী। তাঁদের সকলকে আমার ধন্যবাদ জানাই।

পরিষদের পক্ষ হতে অধ্যাপক পরেশচন্দ্র সাহু, অধ্যাপক সুদর্শন সামন্ত ও শ্রী অর্ধেন্দুশেখর দাস সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন।

এ পুস্তকপাঠে পাঠকগোষ্ঠী যদি বিন্দুমাত্র পরিতৃপ্ত হয়ে থাকেন তবে আমাদের শ্রম সার্থক মনে করব।

বিশ্বমানবতার জয় হউক।

সবস্বতী পূজা
১৮, ফেব্রুয়াবী, ১৯৬৪

সম্পাদক
মেদিনীপুর সংস্কৃতি পরিষদ।

ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক বিবরণ

নন্দীগ্রাম মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার একটি থানা। ইহার উত্তরে হলদী নদী ও পূর্বে ভাগীরথী বা হুগলী নদী প্রবাহিত। দক্ষিণে তালপাটি খাল ও পশ্চিমে ভগবানপুর থানা। আয়তন ১৭১ বর্গমাইল, ভৌগোলিক অবস্থান ২২°১০´ অক্ষাংশ ও ৮৮°৩´ দ্রাঘিমাংশ। ১৯৫১ সালের আদমসুমারীতে অধিবাসী সংখ্যা ১,৫৮,৮১৩। অধিবাসীগণের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের লোক আছে। তন্মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুদের অপেক্ষায় অনেক কম। হিন্দুদের মধ্যে মাহিষ্যরাই গরিষ্ঠ সম্প্রদায়, তন্নিম্নে পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়গণ। শিক্ষা-দীক্ষায় ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য ও করণ এই তিন সম্প্রদায় অগ্রগামী। কিন্তু জনসেবায় ও রাজনৈতিক আন্দোলনে মাহিষ্যরাই শীর্ষস্থানীয়।

এই থানার মধ্য দিয়া দুইটি মাত্র জেলাবোর্ডের রাস্তা অতিক্রম করিয়াছে। একটি তমলুক-কাঁথি রাস্তা। অপরটি সুতাহাটা থানার কুঁকুড়াহাটি হইতে আসিয়া রাণীগঞ্জের মধ্য দিয়া গড়চক্র-বেড়িয়ায় পি. ডব্লিউ বাঁধের সহিত যোগ হইয়া খেজুরী-কাঁথি রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই দুইটি মেটে রাস্তা ছিল। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার তমলুক-কাঁথি রাস্তাটি পাকা করিয়াছেন এবং মহিষাদল হইতে তেরপাখিয়ার মধ্য দিয়া নন্দীগ্রাম পর্যন্ত নূতন রাস্তা চলাচলের উপযোগী করিয়াছেন।

তমলুক-মহিষাদল হইতে নন্দীগ্রামে আসিবার জন্য হলদী নদীর উপর তিনটি নির্দিষ্ট পারাপার ঘাট আছে। নরঘাট, হরিখালি ও

তেরপাখিয়া। সুতাহাটা হইতে আসিবার একমাত্র রাণীগঞ্জ ব্যতীত দ্বিতীয় পারাপার ঘাট নাই।

নন্দীগ্রামের মধ্য দিয়া হিজলী টাইডেল ক্যানেল—হুগলী নদীর গেঁওখালি হইতে ইটামগরা পর্যন্ত আসিয়া হলদী নদী অতিক্রম পূর্বক্ মঙ্গলচক হইতে বিরুলিয়া পর্যন্ত ১১ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া কাঁথির মধ্য দিয়া উড়িষ্যায় গিয়াছে। এই ক্যানেলটি প্রস্তুত হওয়ায় নন্দীগ্রামের পূর্ব-পশ্চিম উভয় পার্শ্বের ভূমিভাগের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে। কারণ পূর্ব পার্শ্বের হুগলী নদীর বন্যা স্রোত ও পশ্চিমপার্শ্বের কেলেঘাই নদীর বন্যাস্রোত ক্যানেলের উচ্চপাড়ে আটক পড়ায় এক পার্শ্বের বন্যাস্রোত অপর পার্শ্বের ক্ষতিসাধন করিতে পারে না। বিশেষতঃ আবহাওয়ার দুর্যোগে ক্যানেলের মধ্য দিয়া পন্যবাহী নৌকা সকল নিরাপদে কলিকাতা ও উড়িষ্যা অভিমুখে যাতায়াত করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত গড়ের খাল, টংগার খাল, মঙ্গলচকের খাল, বুরুন্দার খাল ও কতকগুলি উপখাল থাকায় জল আগম-নিগমের বিশেষ সুবিধা আছে। কিন্তু উহাদের আবশ্যক সংস্কার না থাকায় বহু সময় অসুবিধায় পড়িতে হয়। তাহাতে উৎপন্ন ফসল হাজা মজায় নষ্ট হইয়া অজন্মা ও দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করে। সমগ্র নন্দীগ্রামের ভূমিভাগ নিম্ন ও সমতল।

সুদূর অতীত যুগে তাম্রলিপ্ত যখন একটি স্বতন্ত্র বিরাট সাম্রাজ্য ও সমৃদ্ধি সম্পন্ন বাণিজ্য বন্দর ছিল, তখন পার্শ্ববর্তী মহিষাদল, দরো, গুমগড়, কেওড়ামাল ও হিজলী পরগণাগুলির অবস্থিতি জ্ঞাপক ভূমিখণ্ড সকল বঙ্গোপসাগরগর্ভে নিমজ্জিত ছিল।

কালক্রমে ভাগীরথী ও রূপনারায়ণের এবং কপিশা* বা কংসাবতীর স্রোত প্রবাহে উচ্চভূমিভাগের ক্ষয়িত মৃত্তিকায় এই

---

* ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার কৃত 'বাংলা দেশের ইতিহাসের' প্রাচীন যুগের আর্যাবর্তের মানচিত্র দ্রষ্টব্য।

স্থানগুলি পৃথক পৃথক দ্বীপের সূচিত হইয়া, ক্রমে ক্রমে উহারা বঙ্গোপসাগর হইতে আত্মপ্রকাশ করিয়া ভাটি মহালে পরিণত ও মনুষ্যবাসোপযোগী হইয়া পরবর্তী কালে পার্শ্ববর্তী ভূমিভাগের সহিত সংযুক্ত এবং সুজলা সুফলা বঙ্গভূমির আয়তন বিস্তারে সম্পদশালীনতা বৃদ্ধি করিয়াছে। এই দ্বীপগুলির বিচ্ছিন্নকারক জলস্রোতের আভাষ এখনও নদী বা খালরূপে বর্তমান আছে। এই ভূমিভাগের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিলে জানা যাইবে যে, কংসাবতী ও কেলেঘাইর স্রোতধারার সম্মিলনে যে হলদী নদী, উহা মহিষাদল ও দরো পরগণার অবচ্ছেদক এবং ক্রমান্বয়ে তৎপরবর্তী গুমগড় ও কেওড়ামাল পরগণার অবচ্ছেদক রূপে তালপাটি বা তেখালি ও কুঞ্জপুরের খালদ্বয় বর্তমান। (১) ষোড়শ শতাব্দীতে ডি ব্যারোর ও গ্যাসটণ্ডির অঙ্কিত মানচিত্রে মহিষাদল ও দরো পরগণার দ্বীপটি অঙ্কিত রহিয়াছে ; ও উহাদের পশ্চিমে রূপনারায়ণের একটি প্রশস্তশাখা প্রবাহিত আছে। পরবর্তীকালে সপ্তদশ শতাব্দীতে ভ্যালেন্টিন ও বাউরির মানচিত্রে ঐ নদীর অস্তিত্ব নাই। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে রেনেলের মানচিত্রে তমলুক হইতে টেংরাখালি পর্যন্ত একটি শীর্ণকায়া নদীস্রোত প্রবাহিত আছে। সম্ভবতঃ বাউরি ও ভ্যালেন্টিনের মানচিত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীগুলি অঙ্কিত হয় নাই। (২) রূপনারায়ণের অপর শাখাটি গেঁওখালির নিকটে ভাগীরথীর সহিত সংযুক্ত ও হুগলী নাম ধারণ করিয়া দারো পরগণার পূর্বপ্রান্ত দিয়া বালুঘাটা নামক স্থানে গুমগড়ের—অবচ্ছেদক হলদী নদীর স্রোতধারাসহ কেওড়ামাল ও হিজলী পরগণার খেজুরী দ্বীপকে অতিক্রম করিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত রহিয়াছে।

---

(১) হিজলীর মসনদ্-ই-আলা—(১৯২৭) মহেন্দ্রনাথ করণ।

(২) মেদিনীপুরের ইতিহাস—যোগেশচন্দ্র বসু।

ডিব্যারোর ষোড়শ শতাব্দীর মানচিত্রে ভাগীরথী বা হুগলী নদীর মোহানায় একটি নূতন দ্বীপ উদ্ভূত হইতে দেখা গিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে সেইস্থানে ভ্যালেন্টিনের মানচিত্রে হিজলী ও খেজুরী দুইটি দ্বীপ পর পর পাশাপাশি অঙ্কিত রহিয়াছে। ঐ দ্বীপ দুইটি যথাক্রমে হিজলী ও খেজুরী নামে অভিহিত হইয়া সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কালে উহাতে জনবসতি ও বন্দরাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কাউখালি নামক একটি নদী দ্বারা দ্বীপ দুইটি বিচ্ছিন্ন ছিল। (৩) বর্তমান কাউখালি নদীটি লুপ্ত হইয়া খেজুরী ও হিজলী দ্বীপ দুইটি একসঙ্গে মিলিয়া গিয়া মেদিনীপুর জেলার ভূখণ্ডের সহিত সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে।

প্রাচীন তাম্রলিপ্তরাজ্য কপিশা বা কংসাবতী নদীর উত্তরাংশে বিস্তৃত ছিল। কংসাবতীর দক্ষিণ ভাগ উড়িষ্যার কেশরীবংশীয়, রাজা সার্বভৌম গণের রাজ্যভুক্ত ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর এক চতুর্থাংশের অধিক কাল কেশরীবংশীয় রাজগণ বর্তমান মেদিনীপুর জেলার বৃহত্তম অংশের শাসনকর্তা ছিলেন। তারপর ১১৩১ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাবংশীয় নরপতিগণ তাম্রলিপ্ত হইতে উড়িষ্যায় গমন করিয়া কেশরীবংশের নিকট হইতে কংসাবতী ও হলদী নদীব দক্ষিণ ভূমিভাগে মেদিনীপুর জেলার এই বৃহত্তম অংশ ও বালেশ্বর কটকের সম্পূর্ণ অংশ বিজয় করিয়া একটি স্বতন্ত্র সার্বভৌমরাজ্য গঠন করিয়া তুলেন। (৪) কেশরীবংশের রাজত্বের শেষভাগে তাঁহাদের দুর্বলতার সুযোগে উৎকলের সীমান্তে স্থানে স্থানে কয়েকটি স্বাধীন ও অর্ধস্বাধীনরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ পশ্চিমাংশে দণ্ডভুক্তি রাজ্যটি অন্যতম। পাল ও সেন বংশীয় রাজাদিগের

---

(৩) মছন্দলীর গীত—সেখ বসিরুদ্দিন।

'চৌদিকেতে লোণাপানী মধ্যেতে হিজলী।
তাহাতে বাদসাহী করেন বাবা মছন্দলী॥'

(৪) প্রথমশিক্ষা বাংলার ইতিহাস—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

আমলে খোদিত যে সকল তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেইগুলির পাঠোদ্ধার হইতে জানিতে পারা যায় যে সুশাসনের জন্য তাঁহারা নিজ নিজ রাজ্য নানাখণ্ডে ভাগ করিয়া ছিলেন। (৫) তাহারই প্রধান বিভাগগুলির নাম 'ভুক্তি'।

নন্দীগ্রাম থানার গাংড়া, গোকুলনগর, শিমুলকুণ্ড, আমগেছ্যা, নন্দীগ্রাম, বড়তলিয়া, শ্রীগৌরী, বরাচিরা, ঘোলপুকুর, টাকাপুরা, কুলবাড়ী, ব্রজলালচক প্রভৃতি গ্রামে কতিপয় বৎসর পূর্বে ভগ্ন প্রস্তর মূর্তিগুলি মন্দির হীন বৃক্ষতলায় পতিত দৃষ্ট হইত। এখনও সেইগুলি অনেকস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। সেইগুলিকে বৌদ্ধযুগের পরবর্তী বিষ্ণুমূর্তি বলিয়া অনুমান করা হয়।

বর্তমান কালের প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে মেদিনীপুরের কর্ণগড়ের রাজা যশমন্ত সিংহের রাজসভায় রামেশ্বর ভট্টাচার্য নামক জনৈক সভাসদ ছিলেন। তিনি ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে 'শিবসংকীর্তন' গীতিকাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচিত চণ্ডী কাব্যের প্রায় দুইশত বৎসর পরে উহা রচিত হইয়াছিল। শিব সংকীর্তনের মধ্যে মেদিনীপুর জেলার বহু আঞ্চলিক দেবদেবীর পূজা, উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। (৬) এ দেশের চণ্ডীমঙ্গলের গায়কগণ দেবী বন্দনার সময় রামেশ্বরের ভনিতায় বর্ণিত রায়াপাড়ায় শিবের উপাখ্যান গান করেন।

উহা হইতে জানিতে পারা যায়, তৎকালে রায়াপাড়া একটি পোতাশ্রয় এবং উহার পূর্বভাগে গুমগড়ের এই বিশাল অংশটি সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল।

মোগলযুগ হইতে এই অঞ্চলের ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায়। সম্রাট আকবরের রাজস্ব-সচিব রাজা তোডর মল্ল ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে বাংলা দেশকে ১৯টি সরকার ও ৬৮২টি মহালে এবং

(৫) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩১ সাল ; ২য় সংখ্যা।

(৬) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দীনেশ চন্দ্র সেন।

উড়িষ্যাকে ৫টি সরকার ও ৯০টি মহালে বিভক্ত করিয়াছিলেন। তারপর ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে সুলতান সুজা কর্তৃক সম্রাট সাজাহানের সময়ে বাংলাদেশ ৩৪টি সরকার ও ১৩৫০টি মহালে এবং উড়িষ্যা ১২টি সরকার ও ২-৬টি মহালে বিভক্ত হয়। (৭) উভয়বারেই এতদ্ অঞ্চল অর্থাৎ নন্দীগ্রাম থানার ভূমি ভাগটি মালজেঠিয়ায় অপরিবর্তিত থাকে। বর্তমান কাঁথি মহকুমার এগরা ও রামনগর থানা ব্যতীত সমুদয় অংশ ও হলদী নদীর দক্ষিণ অংশের ভূমিভাগ লইয়া মালজেঠিয়া গঠিত হইয়াছিল। এই সময় উড়িষ্যার সীমারেখা রূপনারায়ণ হইতে পরিবর্তিত হইয়া হলদী নদীর দক্ষিণাংশ চিহ্নিত হয়।

মহিষাদল, দরো, গুমগড়, কেওড়ামাল ও হিজলী প্রভৃতি পরগণাগুলি বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের মিলনে উদ্ভূত। তেমনি নন্দীগ্রাম থানার সোণাচূরা দ্বীপ ঐ বিশাল অবয়বের পরিপুষ্টি করিয়াছে। উক্ত দ্বীপপুঞ্জের বিচ্ছিন্নকারক জলস্রোতগুলির অবস্থানের দিক লক্ষ্য রাখিলেই তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হয়।

খেজুরী সংলগ্ন তালপাটি নদীর উত্তরাংশে এই সোণাচূরা দ্বীপের কোন নিদর্শন দেখা যায় নাই। সম্ভবতঃ ভ্যালেন্টিনের মানচিত্র অঙ্কন কালে উহার উৎপত্তি হয় নাই, অথবা গঙ্গাগর্ভ হইতে সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশ না করায় উহা চিত্রিত হয় নাই। যাই হউক সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে উহার অবস্থান সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারেনা। কারণ ১৬১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জলদস্যুর উৎপীড়নের যুগ গিয়াছে। সুলতান সুজা ঐ সময়ে বাংলা উড়িষ্যার সমুদ্র সীমান্তে শান্তি রক্ষার জন্য কয়েকটি ফৌজদারী গঠন ও দুর্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সোণাচূরা দ্বীপের দক্ষিণে তালপাটী এবং উত্তরে খোসাখালি নামক দুইটি নদী যাহা

---

(৭) প্রথমশিক্ষা বাংলার ইতিহাস—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

বর্তমান খালরূপে বিদ্যমান আছে এবং পশ্চিমে উক্ত নদীদ্বয়ের জলপ্রবাহকে সংযুক্ত করিয়া প্রণালীর আকারে দুমোহনিয়া বা দুনিয়া নামক সুগভীর অপ্রশস্ত খালটি বিদ্যমান আছে। পূর্বে ভাগীরথীর বিশাল তরঙ্গ এবং অপর তিনদিকে তিনটি গভীর পয়ঃস্বিনী ইহাকে গুমগড় ও কেওড়ামালের ভূমিভাগের সহিত সম্পূর্ণভাবে দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন-দ্বীপে পারণত রাখিয়াছিল। দ্বীপটি গঙ্গাগর্ভে অবস্থিত থাকায় জলদস্যু দমনের জন্য উহা গুপ্তগড়ের উপযুক্ত স্থান ছিল। যেহেতু জলদস্যু উপদ্রব নিবৃত্তির পর এই সোণাচূরা দ্বীপের গুপ্তদুর্গের অনাবশ্যক বোধে জঙ্গলাদি পরিষ্কৃত হইয়া উহাতে জনবসতি হইয়াছিল। পরে জনসাধারণ কর্তৃক দুর্গাবস্থিত অংশটির নাম গংগা গড়, গাংগড় বা গাংড়া নামে পরিচিত হইয়াছিল।

জনশ্রুতি আছে সোণাচূরার বালুকাস্তূপের মধ্যে একটি স্বর্ণচূড়া বাহির হওয়ায় দ্বীপটির নাম সোণাচূড়া হইয়াছে।

ইংরাজসরকার কেবলমাত্র শাসনকার্যের শৃঙ্খলার জন্য জেলা, মহকুমা ও থানাদি বিভাগ করিয়াছিলেন। রাজস্ব আদায়ের জন্য পূর্ববর্তী মোগল-শাসনের প্রবর্তিত নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেন নাই। এইজন্য থানার মধ্যে কোন কোন পরগণার অল্পাধিক অংশ যুক্ত-বিযুক্তে সংগঠন করিয়াছেন। এই প্রকার প্রবর্তনে নন্দীগ্রাম থানার মধ্যে গুমগড়, অরঙ্গানগর, জলামুঠা, সুজামুঠা ও কেওড়ামাল পরগণার খণ্ডাংশ পরিদৃষ্ট হইতেছে। কোম্পানি রাজত্বের পূর্বে মেদিনীপুর ও হিজলী দুইটি পৃথক জেলা ছিল। পরে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে হিজলী মেদিনীপুর জেলার সহিত যুক্ত করা হইয়াছে।

গুমগড় পরগণার নামকরণটি 'গুম' ও 'গড়' শব্দ হইতে প্রদত্ত হইয়া থাকিবে। গুম ও গড় দুইটি পারসিক শব্দ। গুম অর্থে গোপন ও গড় মধ্যে গোপন দুর্গ অবস্থিত থাকায় ইহা গুমগড় আখ্যায় অভিহিত থাকা সম্ভব।

'কেওড়া' নামক বন্যবৃক্ষের শ্রেণী হইতে খেজুরী থানার বিস্তৃত ভূমিভাগটি কেওড়ামাল নামে পরিচিত হওয়া সম্ভব।

সম্রাট সাজাহানের রাজত্বকালে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে এবং দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গে মগ ও ফিরিঙ্গী দস্যুগণের অত্যাচার প্রশমনের জন্য খেজুরী থানার খেজুরী ও হিজলীর বাঁকে দুইটি মৃন্ময়দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল। ইহাতে ধারণা হয় নন্দীগ্রাম থানার পূর্ব্ব প্রান্তে সোণাচূড়া দ্বীপের অরণ্য মধ্যে বর্তমান গাংড়া নামক স্থানে উল্লিখিত গংগাগড় বা গাংগড় দুর্গটিও ঐ সময়ে ঐ একই কারণে নির্মিত হইয়া থাকিবে। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে স্কাউটেন গঙ্গার মোহনায় বর্ণিত একটি দ্বীপের অরণ্য মধ্যে একটি মৃত্তিকা নির্মিত দুর্গ দেখিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি নন্দীগ্রাম থানার গুমগড় পরগণার গাংড়ার ঐ গংগাগড় বা গাংগড় দুর্গটির কথা উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। কয়েক বৎসর পূর্বে এই স্থানে কয়েকটি কামানের গোলা ও একটি জাহাজের নোঙর মৃত্তিকাগর্ভ হইতে পাওয়া গিয়াছিল।

হিজলী একটি পৃথক জেলা ছিল। এই জেলার রাজধানী বা মালজেঠিয়া সম্বন্ধে নানা মত রহিয়াছে।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে মহিষাদল রাজ্যের রঙ্গীবসানগড়াধিপতি রাজা রামনাথ গর্গ উক্ত-স্থানের রঙ্কিনী দেবীর সেবাইৎ বংশের অধঃস্তন পুরুষ শ্রীনারায়ণ ভট্টাচার্য তর্কচূড়ামণিকে অরঙ্গানগর পরগণার প্রজাবৃন্দের দৈব-পত্রে যাবতীয় ক্রিয়াকলাপে ধর্মশাস্ত্রমতে বিধি-ব্যবস্থাদি প্রদানের জন্য যে সনন্দলিপি প্রদান করিতেছেন, (৭)

---

(৭) গৌড় ব্রহ্মবাণী পত্রিকা—১ম সংখ্যা ১৩৩৬ সাল।

(সনন্দ প্রতিলিপি)

সনন্দ নং ২৮ শ্রীশ্রী৺মদন গোপাল জীউ।

অরঙ্গানগর পরগণার ব্রজলালচক—মাল ঝাট্যা সাকিনের শ্রীশ্রী৺রঙ্কিণীঠাকুরাণীর চির সেবাইৎ গৌড়াস্ত বৈদিক ব্রাহ্মণ—শ্রীনারায়ণ

তাহাতে উক্ত ব্রজলালচক মালজেঠিয়া দণ্ডপাটের আদিগড় ছিল বলিয়া জানা যায়।

উড়িষ্যার মহামাণ্ডলিক প্রতাপরুদ্র দেবের সময় গৌড়ের সুলতান আলাউদ্দিন সৈয়দ হুসেন খাঁ কর্তৃক উড়িষ্যা আক্রান্ত হইয়াছিল। এই * সময় উড়িষ্যার উত্তরপ্রান্ত রক্ষাকারী মালজেঠিয়ার দেশাধিপতি গোপীনাথ পট্টনায়ক ও গৌড়ের দক্ষিণ-প্রান্ত রক্ষাকারী ছত্রভোগাধিপতি রামচন্দ্র খাঁন ছিলেন। উভয় দেশের মধ্যে জনসাধারণের গমনাগমন নিষিদ্ধ থাকায় সীমান্ত রক্ষক—সশস্ত্র প্রতিহারগণের প্রতি গৌড় হইতে উড়িষ্যা ও উড়িষ্যা হইতে গৌড়ের গমনকারীগণকে পঞ্চমবাহিনী অর্থাৎ

তর্কচূড়ামণির প্রতি ভট্টাচার্য্য গিরি ব্যবস্থা প্রদানী সনন্দ পত্রামিদং কার্য্যঞ্চাগে।

অরঙ্গানগর পরগণার ব্রজলালচক ওগেরহ প্রজাবর্গানং প্রতি আগে। মালুম করিবা তোমাদের উক্ত পরগণার গ্রামদিগর সমূহের উপস্থিতি মতে যাবতীয় ক্রিয়াকলাপাদি ধর্মশাস্ত্রমতে বিধিব্যবস্থাদি প্রদানের ভট্টাচার্য্য গিরি—কার্যে সন ১২৪৮ সাল হইতে যাবৎ ব্রজলালচক মালঝাট্যা গড় সাকিনের—শ্রীশ্রী৺রুক্মিণীঠাকুরাণীর চির সেবাইৎ গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত নারায়ণ তর্কচূড়ামণিকে বাহাল করা গেল। তুমি সমূহ প্রজাহারের ক্রিয়াকর্ম্ম-প্রায়শ্চিত্ত ওগেরহ রীতিমত বিধিব্যবস্থাদি দিবা। এই সনন্দপত্রে পরগণার সমূহ প্রজার প্রতি অনুমতি করিয়া লেখা যায় যে তোমাদের ক্রিয়াকর্ম--যখন যে উপস্থিত হইবে ধর্ম শাস্ত্রানুযায়ী ব্যবস্থা এই ভট্টাচার্য্যের নিকট তৈলবট দাখিল করিয়া ব্যবস্থা লইবা এবং তাম্বুল-দান ও গোবধাদি প্রায়শ্চিত্তের চারি অংশের একাংশ ও ভোজ্যাদি রীতিমত যে পাওনা তাহা উক্ত ভট্টাচার্য্যের নিকট দিবা। ইতি। সন ১২৪৮ সাল তাং ১৬ মাঘ।

স্বাক্ষর
মন্ত্রী শ্রীশিবনারায়ণ মিশ্র।

লিপিকারক মুন্সী
শ্রীজগচ্চন্দ্র ঘোষ।

গুপ্তশত্রুচর সন্দেহে ধৃত বন্দী এবং নির্বিচারে প্রাণদণ্ড পর্যন্ত করিবার রাজকীয় নির্দেশ ছিল। চৈতন্যভাগবত পাঠে তাহা বিশেষভাবে জানিতে পারা যায়।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর চৈতন্যদেব ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে গৌড় হইতে স্থলপথে পুরীযাত্রার অন্তরায় লক্ষ্যে জলপথে গমন করিবার উদ্দেশ্যে গৌড়ের একমাত্র নৌ-বন্দর ছত্রভোগে উপনীত হইয়া তথাকার সীমান্ত-রক্ষী রামচন্দ্র খাঁনকে জলপথে পুরীযাত্রার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। রামচন্দ্র খাঁন চৈতন্যদেবের শ্রীক্ষেত্র দর্শনের ব্যাকুলতা দর্শনে প্রকাশ করেন যে 'উড়িষ্যা গমনে পথমুক্ত করিয়া দেওয়া আমার ক্ষমতাতীত, তথাপি আপনার আকাঙ্ক্ষা পূর্তির জন্য রাজকীয় কঠোর দণ্ডে আমার প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু নৌ-পথে দুর্বৃত্ত জলদস্যুগণের হস্তে অর্পণ করিতে পারি না'। (৮) এই বলিয়া তিনি চৈতন্যদেবকে ছত্রভোগ হইতে হাজিপুরের পথে ফিরাইয়া—রাত্রিযোগে গৌড় ও উড়িষ্যার উভয়সীমায় অনতি-দূরে তমলুকে পৌঁছাইয়া দেন। তমলুক অর্থাৎ তাম্রলিপ্ত তৎকালে উড়িষ্যার মিত্ররাজ্য থাকায় তথা হইতে উড়িষ্যা গমন পথ সম্পূর্ণ নিরাতঙ্ক ছিল।

তমলুক হইতে চৈতন্যদেব মালঝেঠিয়ার পিছলদার পথেই শ্রীক্ষেত্র রওনা হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ পিছলদায় বিশ্রামকালীন দেশাধি-পতি পট্টনায়ক বংশের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক তমলুক হইতে মেদিনীপুরের পথে নারায়ণগড় ও দাঁতনের মধ্য দিয়া চৈতন্যদেবের পুরী গমন পথের উল্লেখ

৮। চৈঃ ভাঃ অঃ ২য় অধ্যায়।

রামচন্দ্র খাঁন বলে শুন মহাশয়। যে আজ্ঞা তোমার সেই কর্তব্য নিশ্চয়॥
সবে প্রভু হইয়াছে কঠিন সময়। সেদেশে এদেশে কেহ পথ নাহি বয়॥
রাজারা ত্রিশুল পুতিয়াছে স্থানে স্থানে। পথিক পাইলে জাসু বলি লয় প্রাণে॥

করিয়াছেন। ওম্যালি সাহেবও উক্ত মতের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। চৈতন্য ভাগবতে চৈতন্যদেবের দুইবার উড়িষ্যাগমনের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম বারে তাঁহার রাজা প্রতাপ রুদ্রদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই। কিন্তু দ্বিতীয় বারে সাক্ষাৎ হইবার বিষয় বিবৃত রহিয়াছে। চৈতন্য চরিতামৃতের সাক্ষাৎ প্রসঙ্গ প্রথম কি দ্বিতীয়-বারে জানিবার উপায় নাই। ওম্যালি সাহেব ও অন্যান্য ঐতিহাসিক-গণের সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিপূর্ণ না হইতেও পারে; হয়ত তাঁহারা প্রথম-বারের, গমনপথের বর্ণনাই করিয়া থাকিবেন। মালজেঠিয়া উড়িষ্যা সাম্রাজ্যের অন্তর্গত থাকায় তথা হইতে উহার অবশ্যই সংযোগ পথ থাকা এবং তমলুক হইতে মালজেঠিয়া পর্যন্ত একটি পথ থাকা খুবই সম্ভবপর। বিশেষতঃ তৎকালে মালজেঠিয়ার মধ্যে পিছলদা উড়িষ্যার একটি খ্যাত সম্পন্ন নৌ-বন্দর বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া-ছিল। সে ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যের সঙ্গে অন্তঃপ্রাদেশিক ও মিত্ররাজ্যাদির যোগাযোগ রক্ষার জন্য উপযুক্ত পথ নিশ্চয়ই ছিল। তন্নচেৎ যোগা-যোগ সংরক্ষণ কিরূপে সুসম্ভব? তমলুক হইতে মালজেঠিয়ার পথটি নরঘাটের মধ্য দিয়া ছিল। কারণ চৈতন্যদেব তমলুক ত্যাগ করিয়া অল্পমাত্র পথ অতিক্রম করিবার পর একটি নদীঘাট পার হইবার সময় পারঘাটায় মাসুল লইয়া গোলযোগ ঘটিয়াছিল। (৯) এই নদীটি সম্ভবতঃ নন্দীগ্রাম থানার উত্তরাংশে প্রবাহিত হলদী নদী হইবে। কতদূর অর্থে কয়েকদণ্ডের পথ অথবা দিনেকের পথকে

(৯) চৈঃ ভাঃ অঃ ২ অধ্যায়। -
'কতদূর গেলে মাত্র দানী দুরাচার। রাখিলেক দান চাহে না দেয় যাইবার॥'

(১১) গৌড়ীয় মঠের সমর্থিত চৈতন্যদেবের পুরীগমন পথের স্মৃতি অনুসরণে কয়েক বৎসর পূর্ব হইতে উত্তর নরঘাটে হলদী নদীর তীরে তাঁহার সেই শুভাগমনকে লক্ষ্য করিয়া স্থানীয় অধিবাসী যুবসঙ্ঘের প্রচেষ্টায় (প্রতিবৎসর) সপ্তাহ কালব্যাপী নাম সংকীর্তনোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

বুঝাইয়া থাকে। তমলুক হইতে হলদী নদীর নরঘাট পারঘাটায় ঐ সময় মধ্যে উপস্থিত হওয়া সম্ভবপর হয় এবং ঐ পর্যন্ত পথকে —কতদূর পথ বলা সম্ভব। অতঃপর তিনি সুবর্ণরেখা অতিক্রম করিয়া ভুবনেশ্বর, বেমুনা প্রভৃতি হইয়া শ্রীক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছিলেন।

পাঠানেরা উড়িষ্যা বিজয় করিবার পর মালজেঠিয়া দণ্ডপাটের শাসনকর্তা পট্টনায়ক বংশের উচ্ছেদ সাধন করতঃ তৎস্থলে মুসলমান শাসনকর্তা নিযুক্ত কবিয়াছিলেন। মালজেঠিয়া গড়ের অদূরবর্তী ভৈরবপুর মৌজাব সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের অবস্থান হইতে এবং ঐ স্থানের ১০০ বিঘা ভূমি মেদিনীপুর মিঞাবাজারের চন্দন সহীদ পীরের—মালজেঠিয়ার দেশাধিপতি কর্তৃক পীরোত্তর (১১) প্রদানের সংবাদ প্রাপ্তে প্রতিপন্ন হয়। তৎপর মোগল অধিকারে ষোড়শ শতাব্দীর পর বলভদ্র মহাপাত্র নামক জনৈক হিন্দু দেশাধিপতিকে হিজলীর মণ্ডলেশ্বররূপে দেখা যায়। সম্ভবতঃ এই সময় বা ইহার অনতিপূর্বে মালজেঠিয়াগড়, ব্রজলালচক হইতে হিজলীর দক্ষিণে বাহিরী নামক স্থানে স্থানান্তরিত হইয়া থাকিবে। পরবর্তীকালে হিজলী মণ্ডলেশ্বরের নিকট রাজস্ব বাকী পড়ায়—হিজলী মণ্ডল, বলভদ্রের হস্তচ্যুত হইয়া পুনরায় মুসলমান শাসকের হস্তে অর্পিত হয়।

কাঁথির নিকট চণ্ডিভেটির কোন এক রহমত ভূঞা হিজলীতে

---

(১১) উক্তচন্দন সহীদ পীরের সেবাইৎগণের নিকট হইতে মেদিনীপুরের কর্ণেলগোলা নিবাসী হরজাই ভকত ভৈরবপুরের পীরোত্তর ভূমি খরিদ করিয়াছিলেন। তৎপুত্র রামরতন ভকত অরঙ্গ নগর পরগণার পাটনা গ্রাম-নিবাসী কৈলাসচন্দ্র ভক্তদাসকে বিক্রয় করায় সেই পীরোত্তর ভূমি বর্তমানে ভক্তদাসগণের দেবোত্তরে পরিবর্তিত হইয়াছে এবং তাহার উপস্বত্ব—মহাপ্রভুর মহোৎসবে ব্যয়িত হইয়া থাকে।

আসিয়া রাজধানী স্থাপন করেন। রহমতের মৃত্যুর পর তাঁহার একমাত্র পুত্র দাউদ খাঁ জমিদারী প্রাপ্ত হন। দাউদ খাঁর ২২ জন পুত্রের মধ্যে তাজ খাঁ ও সিকন্দার খাঁ বিবাহিত পত্নীর গর্ভজাত পুত্র ছিলেন। দাউদ তাঁহার অন্যান্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রগণকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারীতে তাজ খাঁর আনুগত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বালেশ্বর সরকারের মস্‌নদ তাজ খাঁ ও সিকন্দার খাঁকে প্রদান করিয়া যান। হিজলীর অদূবে এখনও সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারীগুলি তাঁহার পুত্রগণেব নামানুসারে অদ্যাপি বিদিত আছে। (১২) তাজ খাঁ মস্‌নদ গ্রহণ করিবার পর মহিষাদল-গুমাই গড়ের রাজা কল্যাণ রায়ের বিতাড়িত তদীয় আত্মীয় ব্রজগোপাল চৌধুরীকে আনুগত্যে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সমর কুশলতায় হিজলীর প্রাচীন অভিজাত বংশের রাজা গোবর্দ্ধন দাসকে হিজলী হইতে সরাইয়া দিয়াছিলেন। (১৩) কিন্তু উক্ত রাজবংশের অতীত বীর্যস্মৃতি স্মরণে শৃঙ্খলায় রাখিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে সহ-সৈনাপত্যে বরণ ও রণঝম্প উপাধি প্রদানসহ সসম্ভ্রমে সুজামুঠার জমিদারীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

অতঃপর তাজ খাঁ মহিষাদল রাজ্য আক্রমণ করিবার আয়োজন করেন। তৎকালে মহিষাদল রাজ্য মহিষাদল, গুমাই, তেরপাড়া, অরঙ্গানগর, কাশিমপুর, শীলামনগর, কেওড়ামাল, নয়াবাদ ও গুমগড় এই আটটি পরগণা লইয়া গঠিত ছিল, (১৪) এবং বড়িয়া বা বীর-নারায়ণ রায় কর্ত্তৃক উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। (১৫) এই বংশের ষষ্ঠ রাজা কল্যাণ রায়চৌধুরী প্রখ্যাতনামা ধার্মিক রাজা বলিয়া ঘোষিত ছিলেন।

(১২) হিজলীর মসনদ্-ই-আলা—১৭ পৃষ্ঠা

(১৩) চৌধুরী চরিত। (প্রাচীন তালপত্রে উৎকলাক্ষরেলিখিত পুঁথি)

(১৪) হিজলীর মস্‌নদ্-ই-আলা—১৪৪, ১৪৫ পৃঃ

(১৫) আর্য্যপ্রভা—১২৮ পৃঃ পণ্ডিত ভগবতী চরণ প্রধান।

মহিষাদলের রাজধানী তৎকালে গুমাইগড়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং মধ্যে উহা কিছু দিনের জন্য অরঙ্গানগর পরগণার আদি মালজেঠিয়া গড়ে পরিবর্তিত হইয়াছিল, কিন্তু তাজ খাঁ কর্তৃক মহিষাদল রাজ্য বিজিত হইলে পর উহা পুনর্বার গুমাইগড়ে আবর্তিত হয়। তাজ খাঁ সসৈন্যে মহিষাদল আক্রমণ করিলে পর কল্যাণ রায় তাঁহার আনুগত্য স্বীকারে সন্ধি প্রার্থনা করেন। এক প্রকার বিনাযুদ্ধেই তাজ খাঁ বিজয়ী হইয়া করদ মিত্র অর্থাৎ উপসামন্তীয়রূপে কল্যাণ রায়কে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়া হিজলী প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। (১৬) মালজেঠিয়া গড়ের অদূরে তাজ খাঁর সৈন্যের ছাউনি মালজেঠিয়ার রথ সড়কের উপর সন্নিবেশিত হইবার জন্য আজও পর্যন্ত ঐ সড়কটি স্থানীয় দেশবাসীর মুখে মছন্দলী ভেড়া নামে অভিহিত রহিয়াছে।

আমাদের ধারণা হয় তাজ খাঁ কল্যাণ রায়কে সমগ্র রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন নাই। সম্ভবতঃ প্রস্তাবিত সন্ধির মূলে মহিষাদলের কতকাংশ তিনি আপন অনুগত ব্যাক্তিগণকে প্রদান করিয়া বৃহত্তম অংশ কল্যাণ রায়কে করদ দিয়া মিত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন। তন্নচেৎ মহিষাদলের পরিবর্তিত রাজধানী মালজেঠিয়া হইতে গুমাইগড় আবর্তিত হইবার কি কারণ থাকিতে পারে। বিশেষতঃ তাজ খাঁ ও তাহার মুখ্য সেনানায়ক ব্রজগোপাল চৌধুরীকে গুমগড় পরগণা দান করিয়াছিলেন কি প্রকারে ?

গুমগড় পরগণার সামসাবাদ গ্রামের মহাপাত্র নামক পুকুরটি ভীমসেন মহাপাত্রের খোদিত বলিয়া কিংবদন্তী আছে। উহার পার্শ্ববর্তী একটি মৌজা যাহা বর্তমান চক্‌কাঞ্চননগর নামে অভিহিত অদ্যাপিও উহা প্রাচীনগণের মুখে দেওয়ানচক বলিয়া পরিচিত হইতে শোনা যায়। ভীমসেন মহাপাত্র তাজ খাঁর মুখ্য দেওয়ান

(১৬) শরিয়তে এস্‌লাম—(মাসিক পত্রিকা) ৭।৮ সংখ্যা, ১৩৩৯ সাল

থাকায় ঐ সুবৃহৎ পুকুরটি তৎকর্তৃক খনিত হওয়া অসম্ভব নহে। তাজ খাঁর অনুগত ও অনুগ্রহপুষ্ট গুমগড়ের চৌধুরী বংশের ভূস্বামীগণ সুনিশ্চয় কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন জন্য গুমগড়ের কতকগুলি মৌজার নাম তাজ খাঁর বংশধরগণের নামানুসারে ঘোষিত করিয়াছেন। এইভাবে গুমগড় পরগণার সামসাবাদ, তানগর, তাজপুর, ওসমানচক, হোসেনপুর, মহম্মদপুর, মাণিকপুর, দাউদপুর, শাপুর, সুলতানপুর, বাহাদুরপুর ও মুরাদপুর প্রভৃতি মৌজাগুলির নামকরণ হওয়া যুক্তিপূর্ণ এবং সেই সিদ্ধান্তে মহাপাত্র পুকুর ও পার্শ্ববর্তী দেওয়ানচক আখ্যা প্রাপ্ত মৌজা দেওয়ান ভীমসেন মহাপাত্রের পদবী ও পদমর্যাদার নিদর্শন বলিয়া অনুমিত হয়। কাজেই পূর্ব বর্ণিত মহিষাদল রাজার সঙ্গে সন্ধিসর্তে গুমগড় পরগণাদি তাজ খাঁ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মহাপাত্র পুকুরের পূর্ব উত্তরাংশে কয়েকঘর উৎকল ব্রাহ্মণের বাসগৃহ আছে, তাঁহারা কটকের যাজপুর হইতে আসিয়া দীর্ঘকাল এদেশে বাস করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করেন। দেওয়ান ভীমসেন মহাপাত্র জাতিতে করণ ছিলেন; সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার স্বজাতি ও জাতীয় পুরোধাকুলের নিঃস্ব ব্যক্তিগণ ও তাজ খাঁর জাতীয় সম্প্রদায়গণকে আনাইয়া এখানে উপনিবিষ্ট করাইয়াছিলেন।

মহিষাদল রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বড়িয়া বা বীরনারায়ণ রায়কে হাণ্টার সাহেব বড়িয়া রায় মহাপাত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই বংশের ষষ্ঠ রাজা কল্যাণ রায় রাজ্যের নানাস্থানে বৃহৎ বৃহৎ জলাশয়াদি খনন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দের একখানি দানপত্রের প্রতিলিপি দৃষ্টে তাহা অনুমান করা হয়।

নন্দীগ্রাম থানার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত কুলাপাড়া গ্রামখানিও সম্ভবতঃ অতীত কলুপাড়া নামের অপভ্রংশ হইতে তাজখাঁর শ্বশুর

হরিসাউর জাতীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ণের জন্য কুলাপাড়া নামে পরিবর্তিত হওয়া সমীচীনবোধক।

কোন কোন ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন গুমাই গড়াধিপতি রাজা কল্যাণ রায়ের নিকট হইতে ঔপনিবেশিক রঙ্গীবসানগড় প্রতিষ্ঠাতা জনার্দন উপাধ্যায় মহিষাদল রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা অলীক সিদ্ধান্ত। কল্যাণ রায়ের পৌত্র উদয়রামের নিকট হইতে জনার্দন উপাধ্যায়ের প্রপৌত্র রাজারাম উপাধ্যায় মহিষাদল রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তবে কল্যাণ রায় ও জনার্দন উপাধ্যায় সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন।

জনার্দন উপাধ্যায়কে ষোড়শ শতাব্দীর অন্তর্বর্তী কালের ব্যক্তি বলিয়া অনেকের সিদ্ধান্ত। তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত স্বীকার করিতে পারি না। কারণ কিছু দিবস পূর্বে তমলুকের গাজনের সন্ন্যাসীরা তরজা কবিতাতে মহিষাদল রাজবংশের নিম্নোক্ত প্রশংসা গান করিতেন।

'আগুহাটে রাজা কল্যাণ পাছু জনার্দন,
দুই রাজাতে চলে যায় বৈকুণ্ঠ ভুবন।
দেশে পড়ে কান্নাহাটি দয়াল রাজার গুণে,
সস্তাদরে ধান বিকালে নাহি ধরে গুণে।
দুর্যোধনের কপট পাশায় গেল জুই ভাড়া,
খাজনা দায়ে প্রজালোক হোল দেশ ছাড়া।
রাম আইল দেশেরে ভাই পড়ে গেল সাড়া,
ঘুরে প্রজা রামশরণকে রাজ্যে দেখে খাড়া।
রামের মত প্রজা পালে রাজা রাজারাম,
সুখের হাসি প্রজার মুখে ফুটে অবিরাম।
পঁয়তাল্লিশের ধাক্কা খেয়ে মুখে নাইক বাক্,
এদিকে শুকলাল চলে পেয়ে যমের ডাক।
দুরাদৃষ্ট প্রজার কষ্ট কেবা আর দেখে,
আন্দিলাল ত পর বিষয়ের পাছে চোখ রাখে!

মারহাট্টা কাট্য' কুট্যা লুট্যা পুট্যা খায়,
মায়ের মত রাণী জানকী বাঁচায় সেই দায়।
ধর্মে মতি রাণী আন্দিলালের জায়া,
দেউলকীর্তি রাখি শেষে ছাড়িলেক কায়া।
সাহেব সুবো এলে দেশে জাত নাইক থাকে,
গাঁয়ে এলে ভাতের হাঁড়ি হাঁড়িপড়ায় রাখে।
সত্যি গেল কলি এল হারামের হোল দেশ,
মহিষাদলের গোপাল সত্য পালা হে ল শেষ।'

আর্যপ্রভাকর মহিষাদলের গুমাইগড় রাজবংশের বড় রাজা কল্যাণ রায়ের দুই পুত্র কাশীরাম ও হৃদয়রামের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। উদয়রাম যৌবন সুলভ চাপল্যে বিলাসিতার চরমে পৌঁছিয়া গুমাইগড়কে সুদর্শনভাবে নির্মিত করিবার জন্য অবিবেচিত হিসাবে অর্থ ব্যয় করিয়া রাজকোষ শূন্য করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পরিশেষে অর্থাভাব প্রযুক্ত ঔপনিবেশিক গড়াধিপতি রাজা রাজারাম উপাধ্যায়ের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়া রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। রাজারাম উপাধ্যায়ের পুত্র শুকলাল উপাধ্যায় ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে, অবশ্য উপযুক্ত কালে লোকান্তরিত হইয়াছেন। ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত অনুসারে উহার রাজত্বকাল ৩০ বৎসর বাদ দিলে ১৭০৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজারাম উপাধ্যায়ের শেষ রাজত্বকাল স্থিরীকৃত হয়। সে স্থলে উদয়রামের রাজ্যারম্ভ হইতে রাজ্যচ্যুত কাল, তদীয় জীবনের মধ্যবর্তী কাল অর্থাৎ ১৫ বৎসর বাদ দিলে ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দ বা কিঞ্চিন্ন্যুন কি কিঞ্চিদধিককাল মধ্যে গুমাইগড়ের পতন কাল স্থিরীকৃত হয়। তদ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গুমাইগড়ের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল।

মহিষাদলের গুমাইগড় বিজয়ের পর তাজ খাঁ তাঁহার জনৈক কর্মচারী 'চৌধুরী' উপাধি বিশিষ্ট ব্যক্তিকে গুমগড় পরগণাটি প্রদান

করিয়াছিলেন। চৌধুরীবংশ (১৭) গুমাইগড়ের ষষ্ঠ রাজা কল্যাণ রায়ের সময়ে গুমগড়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ঐ সময়েই নবাব-সরকার হইতে পশ্চিমাঞ্চলের নবাগত জনার্দন উপাধ্যায় গেঁওখালিব সন্নিকটবর্তী অনাবাদী চরভূমি বন্দোবস্ত গ্রহণে ঔপনিবেশিক রঙ্গীবসানগড় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাবপর তাঁহার প্রপৌত্র রাজারাম উপাধ্যায় কল্যাণ রায়ের পৌত্র উদয়রাম রায়ের নিকট হইতে মহিষাদল রাজ্য লাভ করিয়া গুমাইগড়ের অধিষ্ঠিত বিচারালয় ও কোষাগাব প্রভৃতি রঙ্গীবসানগড়ে উঠাইয়া আনেন। (১৮) রাজারামেব পৌত্রবধূ রাণী জানকী ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে গুমগড় পরগণার জমিদারী নবাব-সরকার হইতে বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, কাজেই তৎপূর্বে গুমগড় পরগণা তাজ খাঁর প্রতিষ্ঠিত চৌধুবী বংশের হস্তগত ছিল। চৌধুরী বংশের শেষরাজা দুর্গাপ্রসাদ চৌধুরী রাজস্ব প্রদানে শৈথিল্য প্রকাশ করায় নবাব-সরকার তাঁহাকে জমিদারী হইতে সরাইয়া দিয়াছিলেন। মোটামুটি হিসাবে কল্যাণ রায়ের সময় হইতে দুর্গাপ্রসাদ চৌধুরীর জমিদারী হইতে অপসৃতের সময় ১৭৬১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় একশত বৎসর গুমগড় পরগণা চৌধুরী বংশের হস্তগত ছিল। চৌধুরী বংশের কোন নিদর্শনমূলক বংশপত্র অথবা প্রাচীন পুস্তকাদি প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে নন্দীগ্রাম থানার তাজপুর নিবাসী দ্বারকানাথ মণ্ডল মহাশয়ের নিকট তদীয় পিতামহেব সংরক্ষিত একখানি উৎকলাক্ষরে লিখিত 'চৌধুরীবংশ চরিত' নামক তালপত্রের পুঁথিতে চৌধুরীবংশের যে টুকু বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে চক্রবেড়িয়া গড়ের আদি জমিদার ব্রজগোপাল চৌধুরীর নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। গুমগড়ের চৌধুরী বংশের জমিদারী গড়-চক্রবেড়িয়ায় প্রতিষ্ঠিত হইবার পর উহা গড়চক্রবেড়িয়া

(১৭) হিজলীর মস্‌নদ্‌-ই-আলা—১৪২ পৃঃ

(১৮) মহিষাদল রাজবংশ—পণ্ডিত ভগবতীচরণ প্রধান।

নামে অভিহিত হইয়াছে। (১৯) 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' রচয়িতা যোগেশচন্দ্র বসু ও 'হিজলীর মস্‌নদ্‌-ই-আলা'র গ্রন্থকার মহেন্দ্রনাথ করণ চৌধুরী জমিদারগণকে কায়স্থবংশীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু হস্তলিখিত চৌধুরীবংশচরিত পুঁথিখানিতে ব্রজগোপাল চৌধুরী গুমাইগড়ের রাজমাতুল বলিয়া নিজেকে হিজলী দরবারে পরিচিত করায় তিনি যে প্রকৃত কায়স্থ (২০) নহেন তাহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে।

ব্রজগোপাল চৌধুরী আর্থিক বিপর্যয়ে পড়িয়া গুমাইগড়ে কর্মপ্রার্থী হওয়ায় তদীয় ভগিনী কর্তৃক অসম্মানিত হন পরে হিজলী দরবারে হিজলী নবাবের আনুগত্য লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালে হিজলীর অধিপতি তাজ খাঁ নিজেকে নবাব—কদাপি 'পাতসাহ' বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেন। ব্রজগোপাল উঁহার আশ্রয়লাভ ও শরীর-রক্ষী হইয়া পরিশেষে প্রধান সেনাপতির পদপ্রাপ্তে বহু জমিদারী দখল করিয়াছিলেন। এমন কি হিজলীর প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন প্রাচীন রাজবংশের তৎকালীন রাজা গোবর্ধন দাসকে কৌশলে পরাজিত করিয়া তাজ খাঁর আনুগত্যে সুজামুঠায় স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন এবং গোবর্ধন দাসকে 'রণঝম্প' উপাধিতে ভূষিত ও তাজ খাঁর সহ-সেনানায়ক পদে বৃত করিয়া সমগ্র হিজলী প্রদেশে তাজ খাঁর নিষ্কণ্টক আধিপত্যের বিজয় কেতন উড়াইয়া ছিলেন।

---

(১৯) চৌধুরীবংশচরিত—

'গঙ্গাতটরে চক্রবেড়ে। অতল স্রোতে ধারা ঘিরে॥
উত্তম স্থান লক্ষ্য করি। তথিরে গড়ি গড়বাড়ী॥

* * *

চৌধুরীরে করি দণ্ডধর। পাতসাহ ছাড়ে গুমগড়॥

(২০) চৌধুরীবংশ চরিত—

'ব্রজগোপাল অভাজন। পদবী চৌধুরী আখ্যান।
হই গুমাই রাজ মাতুল। নির্ধনী দীন সমতুল॥

পরে মহিষাদল রাজ্য আক্রমণ করিয়া মহিষাদলের বীরদর্পী রাজা কল্যাণ রায়কে প্রায় বিনা যুদ্ধে সন্ধি স্থাপনে বাধ্য করাইয়াছিলেন। নবাব তাজ খাঁ বিজিত মহিষাদল রাজ্যের একাংশ গুমগড় পরগণাটি মহিষাদল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া কল্যাণ রায়কে বৃহত্তর মহিষাদলের করদ মিত্র রূপে প্রত্যর্পণ করিয়া হিজলী প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রত্যাবর্তন পূর্বেই হুগলী নদীতীরে চক্রবেড়িয়া নামক স্থানে গড় আদি নির্মাণ করিয়া গুমগড়ের শাসনভার প্রত্যুপকারের নিদর্শন স্বরূপ ব্রজগোপাল চৌধুরীকে ইনাম প্রদান করেন। পরে ব্রজগোপাল চৌধুরী গুমগড়ের একখানি অনুর্বর মৌজা হিজলী মণ্ডলের মহাপাত্র ভীমসেন মহাপাত্রকে প্রদান করায় ভীমসেন তথায় একটি জলাশয় খনন করিয়া আপন আত্মীয়-স্বজন ও স্বজাতীয় পুরোধাগণকে উপনিবিষ্ট করাইয়াছিলেন। অদ্যাপি ঐ ধ্বংসপ্রায় জলাশয়টি 'মহাপাত্র পুকুর' নামে সামাসাবাদ গ্রামে পরিচিত রহিয়াছে।

ব্রজগোপালের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র নন্দীগোপাল জমিদারী লাভ করিয়া নিজ নামানুসারে নন্দীগ্রাম নামে একটি মৌজা প্রতিষ্ঠা এবং রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য নন্দীগ্রাম, ভেটুরিয়া ঘোলপুকুর নামক তিনটি স্থানে তিনটি তহশীলকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। ভেটুরিয়া তহশীল কেন্দ্রটি রাণী লগ্নামণির নামানুসারে 'লগ্নামণি গড়' ও ঘোলপুকুরে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺কালীঠাকুরাণীর নামানুসারে 'কালীগড়' নামে অভিহিত হইয়াছিল। এতদ্‌ঞ্চলের প্রাচীন-প্রাচীনাগণের মুখে নন্দীগ্রামকে ননীগাঁ নামে অভিহিত হইতে শুনিয়াছি। তাহাতে বিশ্বাস হয় নন্দীগোপালের ভিন্ন নাম ননীগোপাল ছিল। নন্দীগোপাল বহু সৎকর্মের দ্বারা প্রজা সাধারণের নিকট রাজা আখ্যায় অভিহিত হইয়াছিলেন।

তৎকালে মগ ও পর্তুগীজ দস্যুরা সাগরদ্বীপে আড্ডা স্থাপন করিয়া হিজলী প্রদেশের সমৃদ্ধিসম্পন্ন স্থানগুলি লুণ্ঠন করিত। গুমগড়ে চৌধুরী জমিদারী প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে উহার অরণ্য অধ্যুসিত পূর্বাঞ্চলটি জনপদে পরিণত ও সমৃদ্ধশালী হইতে সূচিত হওয়ায় ইহার দিকেও দুর্ধর্ষ দস্যুদলের লোলুপ দৃষ্টি পতিত হয়। ফলে সেই সকল দস্যুকবল হইতে জমিদারী রক্ষার জন্য নন্দীগোপাল চক্রবেড়িয়াগড়ের সম্মুখস্থ সেনাবাসটিকে দৃঢ়তর মৃন্ময় দুর্গে পরিণত করেন ও নদীতীর সংরক্ষণের জন্য পাঁচখানি রণতরী নির্মাণ করিয়াছিলেন। (২১) গড়ের খালের মোহনায় সশস্ত্র সৈন্যদলসহ কুমার কৃষ্ণপ্রসাদ সর্বদা প্রহরারত থাকিতেন। প্রাচীন-প্রাচীনাগণের নিকট চৌধুরীদের 'লড়াই লা'-এর গল্প শুনিয়াছি ; সম্ভবতঃ তৎকালে রণতরী অর্থাৎ নৌকাকে সাধারণে 'লড়াই লা' নৌকা আখ্যা দিয়া থাকিবে। চৌধুরীবংশচরিতে ময়ূরপঙ্খী (২২) জলযান বলিয়া উল্লেখ আছে।

পরিণত বয়সে ননীগোপাল লোকান্তরিত হইলে কৃষ্ণপ্রসাদ জমিদারী গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রথম জীবন জলদস্যুর প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নদীবক্ষে অতিবাহিত হইয়াছিল। জমিদারী গ্রহণের পর-মুহূর্তে স্থলপথের একদল দস্যু আসিয়া জমিদারী আক্রমণ করিল। উহারা মহারাষ্ট্রের অধিবাসী,—এতদ্দেশে বর্গী নামে সুপরিচিত। রাজ্যস্পৃহা অপেক্ষা অর্থলুণ্ঠনই উহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। উহারা প্রজাদের নিকট বলপূর্বক রাজস্ব আদায় করিতে সুরু করিল এবং উৎপন্ন ফসলের এক চতুর্থাংশ দাবি স্থির করিয়া চূড়ান্ত নির্যাতন

---

(২১) চৌধুরীবংশচরিত।

চৌধুরীবংশচরিত—'ময়ুরপঙ্খী জলযান, গড়ন করি পঞ্চখান
ভাসারেতাকু গঙ্গাজলে, দমন কলেমগদলে।'

দ্বারা জনসাধারণকে আতঙ্কিত করিয়া তুলিল। (২৩) ক্রমে উহাদের অমানুষিক অত্যাচারে দেশ জনহীন হইয়া পড়িল। বর্গী সৈন্যেরা প্রজাগণের ঘরবাড়ী ও কৃষিক্ষেত্রের সুপক্ক ফসলে অগ্নি সংযোগ করিয়া ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। উদ্বাস্তু প্রজার দল ঘর ছাড়িয়া নিরাপদ স্থানের অনুসন্ধানে ছুটিল। বহুগ্রাম নির্জন অরণ্যে পরিণত হইল। জমিদারীর ধ্বংস পরিণতি দৃষ্টে দুর্দান্ত মগদস্যু বিজেতা কৃষ্ণপ্রসাদ সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। পরিশেষে কৃষ্ণপ্রসাদ বর্গীসর্দারের নিকট আনুগত্য স্বীকার ও এককালীন দ্বাদশ লক্ষ কাহন কড়ি উপঢৌকন প্রদান করিয়া জমিদারী বর্গী কবল মুক্ত করিলেন। মহিষাদলের রাজা রাজারাম উপাধ্যায় কৃষ্ণপ্রসাদের সহিত আপন পুত্র শুকলাল উপাধ্যায়ের বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন।

বর্গীর অত্যাচারে ও লুণ্ঠনে গুমগড়ের জমিদার কৃষ্ণপ্রসাদকে শুকলাল উপাধ্যায় সর্বপ্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন। বর্গী উপদ্রব প্রশমনের পর নিরুদৃষ্ট প্রজাগণকে জমিদারীতে পুনরাগত করাইবার জন্য কৃষ্ণপ্রসাদ অবারিতভাবে সাহায্য করিয়া সর্বস্বান্ত হইয়া পড়েন। শেষ জীবনে মর্মান্তিক দুঃখে ক্ষোভে কৃষ্ণপ্রসাদ পরলোকগত হন।

তৎপুত্র দুর্গপ্রসাদ চৌধুরী নিঃস্ব ও ঋণগ্রস্থ জমিদারীর পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। এই কারণে দুর্গাপ্রসাদের নিকট নবাব-সরকারের প্রভূত রাজস্ব বাকী পড়িয়াছিল। দুর্গাপ্রসাদ শুকলাল উপাধ্যায়ের নিকট প্রচুর ঋণ করিয়াও জমিদারী সুপরিচালনে সমর্থ

(২৩) চৌধুরীবংশচরিত—

‘অস্বীকার কলে যেউ জন। তাকু ধরি মকামে লেইন।
শীত দিনরে রাত্রিকালে। বসায়ে থুই গলাজলে॥
শিরে দেই ভিজা খড় বিণ্ডা। শাসই সজোরে মারি ডাণ্ডা॥
রোদ দিনরে খরারে রই। এমন্তে বর্গী তশীল করই॥’

হন নাই। রাজা শুকলালের লোকান্তে রাজা আনন্দলাল দুর্গাপ্রসাদের নিকট ঋণ আদায়ের জন্য উহার বিরুদ্ধে নবাব-সরকারে অভিযোগ উত্থাপন করায়, নবাব-সরকার তাহার ঋণ ও সরকারী অনাদায়ী রাজস্ব আদায়ের জন্য গড়চক্রবেড়িয়া জমিদারীর আদায় কার্যের ভার আনন্দলাল উপাধ্যায়ের উপর অর্পণ করেন। যতদিন তাহার ঋণ ও সরকারী রাজস্ব নিঃশেষে পরিশোধিত না হইবে ততদিন দুর্গাপ্রসাদ চৌধুরী মাসহারা প্রাপ্ত হইবেন। সমস্ত ঋণাদি পরিশোধিত হইলে পর উহাকে জমিদারী প্রত্যপর্ণ করা হইবে। এইভাবে রাজা আনন্দলাল মহিষাদল পরগণার কাঞ্চনপুর নিবাসী চিরঞ্জীব বাড়াইকে নায়েব নিযুক্ত করিয়া ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে রাজস্ব আদায়ের জন্য গুমগড়ে প্রেরণ করেন। তিনি গুমগড়ের বয়াল নামক গ্রামে ছাউনি ফেলিয়া রাজস্ব আদায় করিতে আরম্ভ করায় দুর্গাপ্রসাদ তাহাকে সক্রোধে হত্যা করেন। সংবাদ শ্রবণে আনন্দলাল অবিলম্বে পরাক্রান্ত সর্দার ও পাইক সৈন্য প্রেরণ করেন এবং নবাব-সরকারেও দুর্ঘটনা জ্ঞাপন করেন। নবাব-সরকার সৈন্যদলসহ মুহম্মদ রেজা খাঁকে প্রেরণ ও দুর্গাপ্রসাদকে শৃঙ্খলিত করিবার অনুমতি প্রদান করেন। দুর্গাপ্রসাদ পূর্ব হইতে সেই সংবাদ শ্রবণে জমিদারী ত্যাগ করিয়া গোপনে সুজামুঠার রাজধানী কাজলাগড়ে আশ্রয় গ্রহণ কবেন। তৎকালে সুজামুঠা জমিদারী স্বতন্ত্র ও স্বাধীন থাকায় মহিষাদলের রাজা বা নবাব-সরকার উহা আক্রমণ করিতে পারেন নাই। দুর্গাপ্রসাদ সুজামুঠার তদানীন্তন রাজা মহেন্দ্রনারায়ণের সাহায্যে গুমগড় পুনরধিকারের জন্য যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হন। ইত্যবসরে মুর্শিদাবাদ হইতে নবাব-সরকারের দ্বিতীয় সৈন্যদল আসিয়া পড়ায় দুর্গাপ্রসাদ সুজামুঠা ত্যাগ করিয়া মহারাষ্ট্রভুক্ত অঞ্চল অধিকার পটাশপুরে পলায়ন করেন। সমাগত নবাব সৈন্যদল দুর্গাপ্রসাদের ভেটুরিয়া ও নন্দীগ্রাম গড় দুইটি লুণ্ঠন ও চক্রবেড়িয়াগড় অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত করিয়া প্রত্যাবর্তন করে। অতঃপর কিছুদিন পরে

দুর্গাপ্রসাদ নবাবের নিকট আত্মসমর্পণ ও বশ্যতা স্বীকার করায় তাহাকে খান্দারের জমিদারী অর্পণ করা হয়। খান্দারের জমিদারী লাভের অল্প দিন পরে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে দুর্গাপ্রসাদ পরলোক গমন করেন।

চক্রবেড়িয়া স্থানটি তৎকালে হুগলী নদীর তীরদেশে অবস্থিত ছিল। হুগলী নদী হইতে চক্রবেড়িয়ার দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্ত দিয়া একটি সুগভীর খাল উত্তর দিকে চিল্লগ্রাম পর্যন্ত প্রবাহিত রহিয়াছে। এখনও উহা গড়ের খাল নামে অভিহিত হইয়া থাকে এবং গড়ের উত্তরাংশের কৃষককুলের হলচালিত ক্ষেত্রটিকে 'গড়ের মাঠ' বলিয়া জনসাধারণ নির্দেশ করিয়া থাকে। বর্গীর অত্যাচার, নবাব সৈন্যের লুণ্ঠনও চৌধুরী বংশ উচ্ছেদের পর পৌনঃপুনিক প্লাবনে উহার অতীতের স্মৃতি প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। গড়ান্তর্বর্তী কয়েকটি স্থানের নাম করণ স্থানীয় অধিবাসীগণের মুখে শ্রুত হওয়া যায়। নামগুলি প্রচলন দোষে অভিধানিক নিরর্থকতায় পর্যবসিত হইয়াছে। যথা—শিরদিবড়ি, কট্‌রিয়া পুকুর, ফুলমঞ্চ, ঘোড়াতাবলা ও মল্লিকপুকুর, প্রভৃতি। শিরদিবড়ির শির অর্থে শ্রেষ্ঠ ও দিউড়ির অপভ্রংশ দিবড়ি নামে খ্যাত হইয়াছে। উহা শ্রেষ্ঠদ্বার বা সিংহদ্বার বলিয়া মনে হইতেছে। কট্‌রিয়া পুকুর পুকুরটি ক্ষুদ্র বিধায় কটিয়া শব্দ হইতে কটরিয়ায় পরিবর্তিত হইয়াছে। উড়িয়া ভাষায় ক্ষুদ্রকে কটিয়া বলিয়া প্রকাশ করে। ফুলমঞ্চ মালঞ্চ শব্দটি ব্যবহার দোষে মঞ্চে পরিণতি ঘটিয়াছে। ঘোড়াকে খাদ্য দিবার জন্য মৃত্তিকা বা কাষ্ঠ নির্মিত পাত্রকে তাবল বলে, সম্ভবতঃ ঐ স্থানে ঘোড়াকে তাবলে খাদ্য খাওয়ান হইত বলিয়া ঘোড়াতাবলা নামে অভিহিত হইয়াছে। মল্লিকপুকুর মল্লক্রীড়া ক্ষেত্রস্থ পুকুরটি মল্লপুকুর হইতে নিশ্চয় মল্লিক পুকুরে পরিবর্তিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ঠাকুরবাড়ী, ভোগশালা ও তোষাখানা প্রভৃতি নাম যুক্তে কয়েকটি স্থানকে অভিহিত হইতে শোনা যায়।

গড়ের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ও মল্লপুকুরের পূর্বাংশে একটি দীঘিকে জনসাধারণ কামান দীঘি বলিয়া থাকিত। বহিঃশত্রু :হইতে গড় রক্ষাব জন্য ঐ স্থানটিতেই সৈন্যাবাস ছিল বলিয়া বিশ্বাস হয়। দীঘির পাড়ে কয়েকটি উচ্চ মঞ্চ ছিল, উহা যে কামান বসাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমিত হয়। দীঘির চারিদিকে বর্গক্ষেত্রাকারে বহুদূর ব্যাপিয়া প্রশস্ত উচ্চ বাঁধ নির্মিত ছিল। বাঁধের বহিঃপ্রান্তে ও দীঘির চতুর্দিকে সাবিবদ্ধাকারে বেউড় বাঁশের ঝাড় রোপিত ছিল। ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই স্থানে একটি কামানের ভগ্নাংশ ও ২১৩টি লৌহ গোলক দৃষ্ট হইত। বাঁধ পরিবেষ্টিত আভ্যন্তরীণ ভূমিভাগসহ দীঘির পরিমাণ ৮ একব ১৬ শতাংশ পবিমিত ছিল। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দেব মহাপ্লাবনের পর (উনপঞ্চাশের বন্যা) ইংরাজ সরকার উহার উপর একটি রিফিউজ ট্যাঙ্ক খনন করিয়া গুমগড়ের এই ধ্বংসাবশেষ স্মৃতিটুকুর বিলোপন সাধন করিয়াছেন। গড়বাড়ীটিও কতকগুলি প্রজার বাসভূমিতে রূপান্তরিত হইয়া চৌধুরী বংশের সমস্ত স্মৃতি সাক্ষীকে চিরদিনের জন্য বিস্মৃতির নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়াছে।

রাজা আনন্দলাল উপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার কোন বংশধর বিদ্যমান না থাকায় তদীয় পত্নী রাণী জানকী জমিদারী গ্রহণ করেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী সনন্দ গ্রহণে, জমিদারী সমূহ পুনর্বন্দোবস্ত প্রদান করিতে আরম্ভ করায় রাণী জানকী ও তাঁহার জমিদারীর রাজস্ব নির্ধারণ করিয়া বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন। উক্ত বন্দোবস্তের সময় গুমগড় মহিষাদল জমিদারীর অন্তর্গত হয় নাই। পরে ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে গুমগড় নূতন বন্দোবস্ত গ্রহণ করায় সেই সময় হইতে উহা মহিষাদল জমিদারীর অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। গুমগড় প্রাপ্তির ৩৭ বৎসর পরে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে রাণী জানকী নন্দীগ্রামে জানকীনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গুমগড়ের বহুস্থান থাকা সত্বেও নন্দীগ্রামে মন্দির

স্থাপনের উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ অতীত চৌধুরীবংশের নন্দী গোপালের স্মৃতির সঙ্গে তাঁহার নবাগত স্মৃতিটিকে সংযুক্ত রাখা।

রাণী জানকী ও তমলুকের রাজা আনন্দ নারায়ণ রায় তাঁহাদের রাজ্য সংরক্ষণের জন্য নিজ নিজ সৈন্য দলকে পাশ্চাত্য যুদ্ধ বিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। উহাদের সৈন্যদল কোন অবাঙ্গালীকে লইয়া গঠিত হয় নাই। উহা নন্দীগ্রাম, মহিষাদল, তমলুক ও ময়না প্রভৃতি অঞ্চলেব অধিবাসীগণকে লইয়া গঠিত হইয়াছিল। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি রাণী জানকীর নিকট হইতে এই সৈন্যদলের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া মাদ্রাজ প্রদেশের ভোলার মিউটিনি দমনে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। (২৪) সেখানে কোম্পানির কর্ণেল পাওয়েল সাহেব উহাদেব অদম্য সাহস ও বীরত্বেব প্রশংসা করিয়াছিলেন। এইরূপ মহীশূর যুদ্ধক্ষেত্রেও ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস সেনাপতি আইরি কুটের পরিচালনাধীনে হায়দর আলি ও টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে বাংলা হইতে সৈন্যদল প্রেরণ করিয়াছিলেন। (২৫) এই সৈন্যদলের মধ্যে তমলুক ও মহিষাদলের সৈন্যদলই সর্বপ্রধান ছিল. (২৬) মহীশূর যুদ্ধে উহারা ইংরাজ সৈন্যদলের অগ্রগামী হইয়া বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল। উহাদের বীরত্বকাহিনী ভারত সরকারে লিপিবদ্ধ দৃষ্টে পরবর্তী গভর্ণর জেনারেল স্যার জনশোর তমলুক রাজাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। কোম্পানি এই সময় হইতে এই অঞ্চলের বাঙালী বীর যুবকগণকে সযত্নে সৈন্যদলে গ্রহণ করিতেন। ইহার পূর্বেও নন্দীগ্রামের বহু রণপারদর্শী বীরবৃন্দ হিজলীর পরবর্তী সুজামুঠা রাজ্যে ও মহিষাদলের পূর্ববর্তী রায় রাজাগণের রাজ্যে সৈন্য বিভাগে কার্য করিতেন।

---

(২৪) তমলুকেব ইতিহাস—সেবানন্দ ভারতী

(২৫) ভারতবর্ষের ইতিহাস—নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

(২৬) বাঙ্গালীর বল—রাজেন্দ্র লাল আচার্য

গুমগড়ের জমিদার নন্দীগোপাল ও কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরী জলদস্যু ও বর্গীর উপদ্রব নিবারণের জন্য এই শ্রেণীর একদল সৈন্য রক্ষা করিতেন। গড়চক্রবেড়িয়ার সম্মুখস্থ সৈন্যাবাসের ধ্বংসাবশেষ স্মৃতি হইতে তাহার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। মহিষাদলের রাজা আনন্দলাল উপাধ্যায় নবাব-সরকার হইতে রাজস্ব আদায়ের অধিকার প্রাপ্ত হওয়ায় দুর্গাপ্রসাদ চৌধুরী সুজামুঠার রাজার সাহায্যে মহিষাদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তাহাতে প্রমাণিত হয় য,—দুর্গাপ্রসাদের নিজস্ব সৈন্যদল না থাকিলে তিনি কখনও যুদ্ধ বিপ্লবের অনুবর্তী হইতেন না। তবে প্রবল প্রতাপশালী নবাব সৈন্যের প্রতিকূলে যুদ্ধ পরিচালনার মত যথেষ্ট সৈন্যবল বা রণসম্ভার তাঁহার ছিল না। মহিষাদল নবাব সৈন্যের সাহায্য প্রাপ্ত হওয়ায় সম্ভবতঃ সুজামুঠার রাজা মহিষাদলের বিরুদ্ধাচরণে আপন শক্তি-ক্ষয়ের অনভিমত প্রকাশ করায় নিরুপায় হইয়া দুর্গাপ্রসাদকে মহারাষ্ট্র অধিকারে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছিল।

পরে ইংরাজ সরকার এতদ্দেশ হইতে সৈন্যসংগ্রহ প্রথা রহিত করিয়া উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে সৈন্য নির্বাচিত করিতে থাকায় বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ও জমিদারী হইতে রণশক্তি পোষণ উচ্ছেদ করায় সেই সকল দেশীয় সৈন্যগণের অতীত বলবীর্যের কাহিনী ও পরিচিতি কালের আবর্তনে নিবিড় অন্ধকার গর্ভে বিলুপ্ত হইয়াছে। নন্দীগ্রাম থানার মধ্যে বহুস্থানে আজও তাহার একমাত্র নিদর্শন, দেশবাসীর মুখে উহাদের জায়গীরলব্ধ ভূমিগুলির (অস্তিত্ব না থাকিলেও) পাইকানা জমির পরিচয়েই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় তৎকালে নন্দীগ্রাম থানার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রণোৎসাহী বীরবৃন্দের অভাব ছিল না। নন্দীগ্রাম অধিবাসীগণের অনেকের পদবী হইতেও তাহাদের অতীত বংশধরগণের বীর্যশক্তির আভাষ পাওয়া যায়। সেনাপতি, দলপতি, সেনা, সাঁতরা, হাজরা, নায়ক, পট্টনায়ক, মল্ল, কোতয়াল

কোটাল, দলই, আদক, সর্দার, রঞ্জিত ও পাইক প্রভৃতি পদবীগুলি নিশ্চয় তৎকালীন রণকুশলতার পরিচায়ক। রণশক্তি উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত সৈন্যদলের বৃত্তিভোগী পাইকানা জমিগুলিও বাজেয়াপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই সকল পদাতিক সৈন্যগণের পরবর্তী বংশধরগণ বৃত্তিচ্যুত হইয়া কিছুকাল পর্যন্ত দেশের ধনশালী ব্যক্তিগণের ভবনে পূজা ও বিবাহাদি উৎসবে পাইকান বা পদাতিক নাচ (ক্রীড়াচ্ছলে সামরিক কৌশল) দেখাইয়া জীবিকানির্বাহ করিতেন। বর্তমানে তাহাও আর দৃষ্ট হয় না।

রাণী জানকী ও রাজা আনন্দনারায়ণ রায়ের মধ্যে অত্যন্ত সদ্ভাব জন্মিয়া ছিল। এরূপ প্রগাঢ় প্রীতিবন্ধন তমলুক ও মহিষাদল রাজ্যের মধ্যে ইতিপূর্বে পরিলক্ষিত হয় নাই। রাজা আনন্দনারায়ণ রাণী জানকীকে মাতার ন্যায় ভক্তি করিতেন এবং তিনিও রাণীর নিকট হইতে সন্তানবৎ স্নেহ প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হন নাই। পরস্পরের রাজ্য পরিচালনা পরস্পরের পরামর্শ ব্যতীত নিষ্পন্ন হইত না, উভয়ের প্রজারঞ্জন দৃষ্টান্ত আদর্শ স্থানীয় ছিল। বাংলার সর্বগ্রাসী ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় ঘোরতর দুর্ভিক্ষের কবলে তমলুক ও মহিষাদলের ন্যায় রাজভাণ্ডার অকাতরে মুক্ত রাখিয়া প্রজারক্ষায় যত্নবান হওয়া মেদিনীপুরের অপর কোন রাজা বা জমিদারের পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে সন্ধির সর্তানুযায়ী ইংরাজেরা মীরকাশেম আলির নিকট হইতে চট্টগ্রাম, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার শাসনভার পাইল; ইংরাজদের রাজত্ব পাইবার পূর্বে ফরাসীদের কয়েকটি স্থানে বাণিজ-কুঠি ছিল। খেজুরী বন্দরে অনেক বিদেশী বণিকদের কুঠি ছিল ও হিজলীর লবণ-শিল্প খুব উল্লেখযোগ্য ছিল। নন্দীগ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে গাংড়া প্রভৃতিতে লবণ তৈয়ারীর খালাড়ী দৃষ্ট হয়। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে বাংলার গভর্নর বিডন সাহেব কোম্পানির লবণ কারবারের একচেটিয়া ব্যবসা বন্ধ করিয়া দিলেন। ফলে

লিভারপুল হইতে লবণ আমদানি হইতে লাগিল। লবণ উৎপাদনের জ্বালানী কাঠের জন্য জালপাই অঞ্চল হইতে কাষ্ঠ সংগৃহীত হইত। এখনও সমুদ্রের নিকটবর্তী অঞ্চগুলিকে জালপাই বলিয়া অভিহিত করা হয়। কর্ণওয়ালিশের দশশালা বন্দোবস্তের পর রাজস্ব বিভাগের বহু পরিবর্তন হয়। হিজলী ও তমলুকে যে দুইজন ইংরাজ সল্ট এজেণ্ট ছিলেন তাহাদের উপর রাজস্ব আদায়েব ভার দেওয়া হয়। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে হিজলী জেলাকে মেদিনীপুর কালেক্টরীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ইংরাজেরা নানাভাবে দেশ শোষণ করিতে আরম্ভ করে। সমস্ত খাসজমি দখল করিয়া পুনরায় বিলি বন্দোবস্ত দিবার চেষ্টা করায় মেদিনীপুরে চুয়াড় বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়াছিল। এইভাবে বৃটিশদের প্রতি এই অঞ্চলের লোকজনের মন বিষাইয়া উঠিতে থাকে।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় সভা প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে উহার প্রতিষ্ঠা ও আন্দোলন প্রবাহ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সপ্তম অধিবেশন ১৯০১ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরের তরুণদল স্বাধীনতা স্পৃহায় উদ্দীপ্ত হইয়া গুপ্ত বিপ্লব প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সন্ত্রাসবাদের প্রসারণ করিয়া তুলিলেন। বিপ্লবী হেমচন্দ্র দাস কানুনগো ও ক্ষুদিরাম বসু প্রভৃতি মেদিনীপুর, তমলুক, ঘাটাল ও নারায়ণগড় প্রভৃতি স্থানে কয়েকটি গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিপ্লববাদ প্রচার করিতে লাগিলেন। মেদিনীপুরের বহুশিক্ষিত ও ধনিক সম্প্রদায় উহাদিগকে নানাভাবে সাহায্য করিতে লাগিলেন। রাজনারাষণ বসু ও নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁন মেদিনীপুরের গুপ্তসমিতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মেদিনীপুরের গুপ্তসমিতির সদস্যগণ এরূপ কর্মদক্ষ ছিলেন যে, তৎকালে তাহাদের উপর বহু দায়িত্বপূর্ণ

কর্মভার অর্পিত হইয়াছিল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বাংলার লাটসাহেব স্যার এনড্রু ফেজারকে মেদিনীপুরের ১৬ মাইল দক্ষিণে নারায়ণগড় ষ্টেশনের নিকট ডহরপুর গ্রামে* বোমার দ্বারা ট্রেন উড়াইয়া হত্যা করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে মজঃফরপূরে কিংসফোর্ড সাহেবকে হত্যার জন্য বিপ্লবী ক্ষুদিরামকে নিয়োগ করা হইয়াছিল।

বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের সময় নন্দীগ্রামেও স্বদেশী ভলেণ্টিয়ার বা সেবকদল গঠিত হইয়াছিল। উহা গুমগড় সেবকসঙ্ঘ নামে পরিচিত ছিল। সেবকদলের মস্তকে স্বদেশী পাগড়ী ও হস্তে দীর্ঘকার বংশযষ্টি নিদর্শন থাকিত। নানাস্থানে যুবক দলকে যষ্টিক্রীড়া শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হইয়াছিল। প্রত্যেক হাট বাজারে ও মেলাস্থানে সেবকসঙ্ঘের শোভাযাত্রা ও সমবেত উচ্চকণ্ঠের বন্দেমাতরম ধ্বনি জনসাধারণের প্রাণে স্বদেশীভাবের উদ্দীপনা জাগাইয়া তুলিত। উহারা মেলাস্থানে পানীয়জল সরবরাহ, নিরুদ্দিষ্ট শিশু ও মহিলার অনুসন্ধান ও আকস্মিক আঘাতপ্রাপ্ত বা সংক্রামক ব্যাধি পীড়িতের শুশ্রূষা প্রভৃতি সেবা কার্য সযত্নে সম্পন্ন করিত।

দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে প্রত্যাগত মহাত্মা গান্ধী রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যে যুগান্তকারী আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়া অহিংস অসহযোগ মন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করিলেন, মেদিনীপুরের জনগণ তাহা অন্তরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিল। বহু আইন ব্যবসায়ী আইন ব্যবসা ত্যাগ করিল—ব্যবসায়িগণ বিলাতি বস্ত্র ও দ্রব্যাদির ব্যবসা বন্ধ করিল—ছাত্রগণ স্কুল-কলেজ বন্ধ করিল। সভা, শোভাযাত্রা ও পিকেটিং ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করিল।

---

* সম্প্রতি ডহরপুর গ্রামে সমাজসেবক সংঘের প্রচেষ্টায় একটি উপ-জাতি উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। মেদিনীপুর সংস্কৃতি পরিষদের সদস্যগণ সেখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন।

জনসাধারণের চিরন্তন স্বাধীনতা স্পৃহা জাগ্রত হইয়া উঠিল, দেশের সর্বত্র কংগ্রেস কমিটিগুলি গঠিত হইয়া সমগ্র দেশে রাজনৈতিক চেতনা বোধ পরিস্ফুট হইল। এই সময় নন্দীগ্রাম থানা কংগ্রেসের সম্পাদক, সভাপতি ও সদস্যগণ নব প্রেরণায় কংগ্রেসের কার্যধারায় জনগণকে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তুলিতে লাগিল। বিদেশী সরকার জনসাধারণের এই জাগরণ সহ্য করিতে পারিল না, তাহারা বিভিন্ন স্থানে অনুসন্ধান ও গ্রেপ্তার কার্য চালাইল, বহু ব্যক্তিকে কারাগারে নিক্ষেপ করিল, কিন্তু গান্ধীজির অহিংস মন্ত্রে দীক্ষিত জনগণ··· প্রিয় জন্মভূমির স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্খায় সমস্ত অত্যাচার নিরুদ্বেগে সহ্য করিল।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী লবণ সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিলেন। এই সময় মেদিনীপুরের জনগণ বিপ্লবের নামে উৎসাহিত হইয়া উঠিল। নন্দীগ্রাম থানার গাংড়া, কালিচরণপুর, ৭নং জলপাই, তেখালিবাজার, নন্দীগ্রাম, আসদতলিয়া, বয়াল, রায়াপাড়া, মহাগ্রাম, মগরাজপুর, নরঘাট, হাঁসচড়া, শ্রীকৃষ্ণপুর, ঘোলপুকুর, আমদাবাদ ও টাকাপুরা প্রভৃতি বহুস্থানে সত্যাগ্রহ সুরু হইল। প্রায় প্রত্যেক স্থানে পুলিশবাহিনী জনতার উপর লাঠিচালনা করিতে বাদ দেয় নাই। ৭নং জলপাইতে জনৈক ৬২ বৎসরের বৃদ্ধ অর্জুন মণ্ডল নামক ব্যক্তি পুলিশের গুলিতে জীবন বিসর্জন দিয়াছিলেন এবং তেখালিবাজারের গুলিতে গোপাল মাঝি নামক জনৈক যুবক সত্যাগ্রহী গুরুতর রূপে আহত হইয়াছিলেন।

এই সময় পুনরায় মেদিনীপুরে বিপ্লবের ভাবধারা জাগ্রত হইয়া উঠিল। বিপ্লবীগণ ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, পেডিকে মেদিনীপুর কলেজের শিক্ষাপ্রদর্শনী হলে গুলি করিয়া হত্যা করিল। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল তারিখে মিঃ আর, কে, ডগলাস জেলাবোর্ডের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবার সময় রিভলভারের গুলিতে প্রাণত্যাগ করে;

ও ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে ফুটবল খেলার মাঠে মিঃ জে, ই, জে, বার্জ নিহত হয়। বিপ্লববাদীদের জিঘাংসানীতিতে তৎকালে শুধু মেদিনীপুরের অধিবাসী নহে, দেশ-বিদেশের বহুব্যক্তি শিহরিয়া উঠিয়াছিল।

মেদিনীপুরে পুনর্বিপ্লব জাগরণে নন্দীগ্রামের এক বিপ্লবী ছাত্র ভুপালচন্দ্র পাণ্ডা বিপ্লববাদের নেতৃত্ব গ্রহণে নন্দীগ্রাম বৈপ্লবিক ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায় উজ্জ্বল করিয়াছে। ভুপালচন্দ্র নন্দীগ্রাম থানার দাউদপুর গ্রাম নিবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত ব্রজমোহন বিদ্যারত্নের কনিষ্ঠ পুত্র। মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটগণের হত্যাভিনয়ের অনুষ্ঠান কালে তাহার বিপ্লবী কর্মজীবনের সূত্রপাত হয়। এই সময় ভুপালচন্দ্র কাঁথি প্রভাত কুমার কলেজের খ্যাতনামা ছাত্র ছিল। মধ্যে মধ্যে বিপ্লবীদের সম্মিলনে যোগদান ও কর্মসূচী নির্ধারণের জন্য তাহাকে বহু সময় গভীর রাত্রিতে কলেজ হোষ্টেল হইতে নিরুদ্দিষ্ট হইতে হইত।

ডগলাস হত্যার ষড়যন্ত্রে সংশ্লিষ্ট না হইলেও ভুপালচন্দ্র বিপ্লবাত্মক অনুষ্ঠানে অর্থ সংগ্রহ ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন। ডগলাস হত্যার-দিবস রাত্রিকালে ভুপালচন্দ্র একদল বিপ্লবপন্থীর নেতৃত্ব গ্রহণে বেলদা (কণ্টাই রোড) রেলস্টেশনের অনতিদূরে কোন ধনীর গৃহে অর্থ লুণ্ঠনের পর সহকর্মীদলকে বিভিন্নপথে কেন্দ্রাভিমূখে পাঠাইয়া দুইজন বন্ধুসহ স্টেশনে পৌছিয়া ট্রেনের অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইত্যবসরে মেদিনীপুর হইতে কাঁথিগামী একখানি পুলিশের গাড়ী স্টেশনে উপস্থিত হওয়ায় তাহার সহগামী বন্ধুদ্বয় পলায়ন করিয়া আত্মগোপন করে, কিন্তু ভুপালের বস্ত্রের মধ্যে কয়েকটি কার্তুজ ও একখানি রিভলভার থাকায় তাহাই গোপন করিবার জন্য দ্রুত পলায়নের সুযোগপ্রাপ্ত হয় নাই। তথাপি উহার চাঞ্চল্যভাব জনৈক পুলিশের দৃষ্টিপথ এড়াইতে পারে নাই।

উক্তপুলিশ নীরবে ও গোপনে উহার গমন পথের অনুসরণে রত হয়। ভুপালচন্দ্রও তাহা লক্ষ্য করিয়া কাঁথিগামী রাস্তায় চলিতে আরম্ভ করে এবং চলিতে চলিতে কার্তুজসহ রিভলভার-খানি ক্ষিপ্রহস্তে বাহির করিয়া একটি জলাশয়ে নিক্ষেপ করতঃ উর্ধশ্বাসে দৌড়াইতে থাকে। পশ্চাদানুসরণকারী পুলিশ তাহা লক্ষ্য করিয়া সঙ্কেত ধ্বনি করায় পুলিশের গাড়ীখানি সেই পথে সবেগে ধাবিত হইয়া মুহূর্ত মধ্যে পলায়মান ভুপালকে ধৃত করিয়া ফেলে, পরে পুনরাবর্তনে সেই জলাশয়ের নিকট আসিয়া পরিত্যক্ত রিভলভারখানি উদ্ধার করে ও রিভলভারসহ বন্দীকৃত ভুপালকে মেদিনীপুরে চালান দেয়।

মেদিনীপুর জেলে শৃঙ্খলিত অবস্থায় এক নির্জনকক্ষে তাহাকে অবরুদ্ধ করিয়া অভিনব শাসন পন্থায় উহার জবানবন্দী গ্রহণ করা হইয়াছিল। কিন্তু অপরাপর সহকর্মীদের নাম ও সন্ধান পাইবার জন্য অমানুষিক নির্যাতনেও যখন সরকারের সমস্ত প্রচেষ্টা নিষ্ফল হইল তখন উহাকে ৬ বৎসরের জন্য আন্দামানে নির্বাসিত করা হইয়াছিল। আন্দামান হইতে প্রত্যাগতের পর কংগ্রেসের সংশ্রবে আসিবাব চেষ্টা করেন, কিন্তু কংগ্রেসের তৎকালীন কর্মপন্থা তাহাকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির গভীর বিশ্বাসে অটল রাখিতে পারে নাই। বিপ্লবের পথই তাহাকে স্বাধীনতা অর্জনে চালিত করিতে লাগিল। স্বাধীনতা লাভের পর নন্দীগ্রাম থানার বহু যুবক উহার কর্মনীতির অনুসরণ লইয়া 'ভাগচাষ আন্দোলন' নামে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে একটি আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিল। কেন্দেমারী ও সাউদ খালি এই দুইটি স্থানে সর্ব প্রথম আন্দোলনের উদ্ভব হইয়া ধীরে ধীরে সমগ্র নন্দীগ্রামে সম্প্রসারিত হয়।

অতঃপর মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মসূচী বিশেষ করিয়া অস্পৃশ্যতা বর্জন আন্দোলন নন্দীগ্রামবাসীর প্রাণে আলোড়ন আনে। মাগুরিয়া গ্রামে উহার প্রথম সূত্রপাত পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

জামবাড়ী নিবাসী পণ্ডিত ভূষণচন্দ্র জোতিষতীর্থ ও ভূতনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয়গণের সহযোগিতায় কংগ্রেসের নীরব কর্মী হরেকৃষ্ণ মণ্ডল মহাশয়ের যত্নে ও অকাতর অর্থব্যয়ে মাণ্ডুরিয়ার মান্নার হাটে অস্পৃশ্যতা বর্জনের বিরাট সভা ও সর্বজনীন ভোজের ব্যবস্থা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনের পর সুভাষ চন্দ্র বসুর নেতৃত্বে যে যুবক আন্দোলন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাহা বেঙ্গল ভলান্টিয়ার (B. V.) নামে খ্যাত। ঠিক ঐ সময় নন্দীগ্রাম থানায় 'গুমগড় সেবক সংঘ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় এবং সংগে সংগে থানা কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয়। গুমগড় সেবক সংঘের কার্যালয় মনুচকে এবং থানা কংগ্রেস কমিটির কার্যালয় বড় পাথুরিয়াতে স্থাপিত হয়। উভয় প্রতিষ্ঠান থানার নানাবিধ সেবামূলক কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে থাকে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ২৬ শে জানুয়ারী সমগ্র দেশে পূর্ণ স্বরাজের দাবী গ্রহণ করায় নন্দীগ্রাম ও তাহার কাছাকাছি এলাকায় উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। ১২ই মার্চ মহাত্মাগান্ধী লবণ সত্যাগ্রহ করিলে তমলুক মহকুমার নন্দীগ্রাম, সুতাহাটা, মহিষাদল থানায় এই আন্দোলন ব্যাপক প্রসার লাভ করে। নন্দীগ্রাম—মহিষাদলের সংযোগ স্থল নরঘাটে লবণ আইন ভঙ্গ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। শ্রীকুমার চন্দ্র জানার নেতৃত্বে একদল সত্যাগ্রহী প্রেরিত হয়। শ্রীহংসধ্বজ মাইতি মহিষাদলে সত্যাগ্রহীদের নেতৃত্ব করেন। পরে শ্রীসতীশ চন্দ্র সামন্ত ও শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সত্যাগ্রহীর দল নরঘাটে উপস্থিত হয়। ইঁহাদের নেতৃত্বে বহু শিক্ষক ও ছাত্র উৎসাহী হয় এবং হাসিমুখে পুলিশের সর্বপ্রকার অত্যাচার সহ্য করিতে থাকে। তদানীন্তন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্যাডী সাহেব এই অহিংস সত্যাগ্রহীকে অবরুদ্ধ করিয়া লাঠি চার্জ করেন। সত্যাগ্রহীর রক্তের স্রোতে এই অঞ্চলের জনসাধারণের মনে দারুণ বিভীষিকা উপস্থিত হইল। অনেকে কারারুদ্ধ হইলেন। নূতন করিয়া সত্যাগ্রহী সংগ্রহ,

স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর দ্বারা অর্থ সংগ্রহ প্রভৃতি কার্য চলিতে থাকে মহিলাগণ যাঁহারা ইতিপূর্বে কোনদিন অন্তঃপুরের বাহিরে আসেন নাই তাঁহারা মুক্ত হস্তে স্বর্ণ রৌপ্য গহনা দান করিতে থাকেন। নরঘাট লবণ সত্যাগ্রহ কেন্দ্রে স্বহস্ত প্রস্তুত এক তেলো লবণ ৫০০৲ টাকা বিক্রীত হইয়াছে। এই সময় যে কয় জন যুবক আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়েন তাহাদের মধ্যে সুধাংশুশেখর ভূঞ্যা, প্রবোধ চন্দ্র জানা, জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র জানা, কানাইলাল সামন্ত, কৃষ্ণপদ বেরা, বারীন বেজ, বিজয় কৃষ্ণ দাস, রবীন্দ্র নাথ বারিক হইল প্রধান। ইহাদের কার্যে সহায়তা করিলেন বরদাকান্ত দাস, ধরণীধর প্রধান, সতীশ চন্দ্র সাহু, নগেন্দ্র নাথ জানা, রাজেন্দ্র নাথ ভূঞ্যা, শ্রীবাস দাস প্রভৃতি।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলনে নন্দীগ্রামের অধিবাসিগণ চৌকীদারী ট্যাক্স বন্ধের আন্দোলন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাতে সমস্ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলি বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয়।

সর্বত্র গোপন দৌত্যদ্বারা সংবাদ আদানপ্রদান ও যোগাযোগ রক্ষিত হয়। গুপ্ত বুলেটিন প্রচার দ্বারা জনসাধারণকে দমননীতির সংবাদ প্রদান ও কর্তব্য অনুসরণের উপদেশ প্রচারিত হইতে থাকে। সর্বপ্রকার উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া জনসাধারন চৌকীদারী ট্যাক্স বন্ধ করিয়াছিলেন। অস্থিরচিত্ত ভীতপ্রবণ ব্যক্তিগণ পরিজনবর্গসহ ভিন্ন থানায় ও সুন্দরবন অঞ্চলে কিছুদিনের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সরকার সমগ্র থানায় পুলিশ বসাইয়া চৌকীদারী ট্যাক্স আদায় করিবার ব্যবস্থা করিলেন। সরকারী কর্মচারিগণ প্রথমে অস্থাবর দ্রব্যাদি ক্রোকের আয়োজন করিল, কিন্তু ক্রোকীমাল বহন করিবার জন্য বহু স্থানে বাহক মিলিল না। প্রথমত, দুই এক স্থানের চৌকীদারগণকে বাহকের কার্য করিবার জন্য উৎপীড়ন করা হইয়াছিল। পরিশেষে উহারাও আত্মগোপন করিতে আরম্ভ করিল। কংগ্রেস শিবিরগুলিতে ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের গৃহাদিতে আবশ্যক বোধে পুলিশের ছাউনি পড়িয়া ছিল। উহারা কারণে অকারণে

জনসাধারণকে ও কংগ্রেস সেবক দলকে প্রহার করিতে লাগিল। পল্লীবাসিগণের বাগান বাগিচা হইতে তরি-তরকারী, ডাব-নারিকেল, কলা, পেয়ারা, প্রভৃতি যেখানে যাহা পাইল অবাধে সমস্তই নষ্ট করিতে লাগিল। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের গৃহ লুণ্ঠন করিয়া—অর্থ অলঙ্কারাদি লুণ্ঠন—সাজসরঞ্জাম ও তৈজসপত্রাদি ভগ্ন এবং ধান, চাউল, কলাই প্রভৃতি একসঙ্গে মিশ্রিত করিয়া অব্যবহার্য করিতে লাগিল। অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত করিয়া কংগ্রেস শিবিরগুলির অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করিল। হাট বাজারের ব্যবসায়িগণের নিকট হইতে বলপূর্বক স্বল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে দ্রব্যাদি গ্রহণ করিতে লাগিল। উহাদের অত্যাচারে দোকানদারগণ অধিকাংশ সময় দোকানগৃহে তালাবন্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু তথাপিও জনগণের স্বদেশ প্রেম ও অদম্য প্রেরণা কিছুতেই দমিত হইল না।

পিউনিটি ট্যাক্স বন্ধের আন্দোলনে জনৈক বালক সত্যাগ্রহীর নির্ভীকতা দর্শনে মুগ্ধ হইতে হইয়াছিল। সেই বালকের নাম রঙ্গলাল প্রধান। নন্দীগ্রামের চন্দননগর গ্রাম নিবাসী প্রেমচাঁদ প্রধানের কনিষ্ঠ পুত্র। এই ত্রয়োদশ বর্ষীয় নির্ভীক বালক পুলিশের অগ্রভাগে দাঁড়াইয়া দেশবাসীকে ট্যাক্স বন্ধের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করায় দুর্দান্ত পুলিশ বাহিনী কর্তৃক ধৃত হইয়া থানায় নীত হইলে তথায় নির্দয়ভাবে প্রহৃত ও জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে। প্রহারে বালকের সর্ব শরীরে অনর্গল শোণিত শ্রাবিত হইতে থাকে। থানা হইতে নির্মম পশুর দল উহাকে চলচ্ছক্তিহীন মুমূর্ষু অবস্থায় নন্দীগ্রাম বাজারের উপর আনিয়া আষাঢ়ের অবিশ্রান্ত বর্ষাধারার মধ্যে কর্দমাক্ত মৃত্তিকার উপর অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া যায়। অদূরে আত্মগোপনকারী অপরাপর সত্যাগ্রহী বন্ধুরা তাহাকে বাড়ীতে আনিয়া সেই রাত্রির মধ্যেই খেজুরী থানার সেরখাঁচক গ্রামে উহার পরিজনবর্গের সহিত স্থানান্তরিত করিয়া আসেন। খেজুরীর সেই অনাত্মীয় স্থানে তাহার আগমন সংবাদ প্রাপ্তে তথায় সমাগত অভয় আশ্রমের একনিষ্ঠ কর্মি

ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত মহাশয় উপস্থিত হইয়া বালকের শোচনীয় অবস্থা দর্শনে ও উহার শরীরে ১৬৫টি বেত্রাঘাতের ক্ষতচিহ্ন দৃষ্টে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি চিকিৎসার জন্য তাহাকে স্বয়ং সঙ্গে লইয়া কলিকাতা গিয়াছিলেন। সেখানে আচার্য পি, সি, রায়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসে তিন সপ্তাহ কাল রাখিয়া সুচিকিৎসার দ্বারা আরোগ্য করাইয়াছিলেন। সেই হইতে নির্ভীক বালক ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়াও কয়েক বৎসর দেশসেবা করিবার পর ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের ২৩শে চৈত্র তারিখে কয়েক দিবস জ্বর ভোগ করিয়া মাত্র ২০ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এইরূপ আরও কয়েকটি যুবক সত্যাগ্রহীর কাহিনীও সেই সময়ে নন্দীগ্রামের গৌরবজ্জ্বল করিয়া সমগ্র বঙ্গদেশের বিস্ময় দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তন্মধ্যে রতনপুরের মাখনলাল মির্দার নাম অন্যতম। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ তারিখে মাখনলাল একাকী অটুট সাহসে থানায় কংগ্রেস পতাকা উঠাইবার জন্য গমন করিয়া বন্দে মাতরম্ ধ্বনি করে। সে সময় থানার সিপাহীরা সকলে আহারে বসিয়াছিল। তাহারা উহার ধ্বনি শুনিয়া…'থানা দখল কর্‌লিয়া, থানা দখল করলিয়া' বলিয়া উচ্চস্বরে চীৎকার করিতে করিতে উচ্ছিষ্ট হস্তে বেত লইয়া মাখনলালকে আক্রমণ ও বেত্রাঘাত আরম্ভ করে। তখন একজন সিপাহী প্রহার জর্জরিত সত্যাগ্রহীকে হুকুম করিল, 'বলো পঞ্চম জর্জ কি জয়'—'বলো সিপাহী লোক কি জয়'; কিন্তু বীর যুবক দৃঢ়স্বরে বলিতে লাগিল, 'দেশমাতা কি জয়'। সিপাহিগণ নির্মম প্রহার করিলেও দৃঢ়চেতা যুবক দাসখত সম্পাদন করিয়া প্রাণ ভিক্ষা চাহিল না।

চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধের আন্দোলনে গোকুল নগর, জামবাড়ী, খোদামবাড়ী, আমদাবাদ প্রভৃতি গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ বিশেষ সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। সত্যাগ্রহীগণকে নন্দীগ্রাম, খোদাম

বাড়ী, শিবরাম পুর, মাণ্ডুবিয়া, মান্নারহাট প্রভৃতি স্থানে বিপুল ভাবে সম্মানিত করা হয়। পরে গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হইলে ঐ সকল কারারুদ্ধ সত্যাগ্রহী মুক্তি লাভ করেন। সত্যাগ্রহীগণ প্রত্যাবর্তন করিয়া কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে বিশেষ চেষ্টা করেন। সুভাষ পন্থীরা এই চুক্তিকে কংগ্রেসের পরাজয় বলিয়া আখ্যা দেয়। এই সময় কংগ্রেস কর্মীরা নানা গঠন মূলক কার্যের মধ্যে আত্মনিয়োগ করেন। নন্দীগ্রাম থানার আমদাবাদ, সুবদী, টাকাপুরা, কমলপুর, ভেকুটিয়া, দুর্গাপুর প্রভৃতি গ্রামে চরকায় সুতাকাটা প্রীতিযোগিতা সুরু হয়। ঐগুলির মধ্যে আমদাবাদ গ্রাম নিবাসী শ্রীযোগেন্দ্র নাথ ভৌমিকের সহধর্মিণী শ্রীস্বর্ণময়ী ভৌমিক প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি করেন। এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে তাঁহাদেব বাড়ীর বস্ত্রাদি হইতে আরম্ভ করিয়া মশারি, এমন কী মাছধরা জাল পর্যন্ত হাতে কাটা সুতায় তৈয়ারী। যাহাই হউক না কেন এই সুতাকাটার মাধ্যমে কংগ্রেস কর্মীগণ দেশের সর্বস্তরের মানুষের মনে এক বৈপ্লবিক চেতনা আনিতে লাগিলেন যাহা পরবর্তী কালে বিয়াল্লিশের আন্দোলনকে সার্থক হইয়াছিল।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হইলে মহাত্মাগান্ধী, সরোজিনী নাইডু, মালব্যজী ভারতবর্ষে ফিরিয়া বোম্বাইতে পদার্পণ কালে গ্রেপ্তার হইলেন। তখন দেশের সর্বত্র এক আন্দোলন আরম্ভ হইয়া যায়। নন্দীগ্রাম থানার তেখালি বাজার, আকন্দ বাড়ী, ফুলনি, ঈশ্বরপুর, মহম্মদপুর, নন্দীগ্রাম, আসদতলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে সহস্র সহস্র নরনারী সমবেত হইয়া শোভাযাত্রা করিতে থাকে। ঐ সময় খোদাম বাড়ী গ্রামের ধরণীধর প্রধান ছাত্রছাত্রীদের লইয়া চারণ গীতি গাহিয়া দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিতে থাকেন। শিবরাম পুরে ১৫ হাজার নর নারীর শোভাযাত্রায় গুলি বর্ষিত হয় এবং তেখালি বাজার লবণ কেন্দ্রে গোপাল মাজি নিহত হয়। ৬৪ বৎসর বয়স্ক অর্জুন

মণ্ডল স্বগৃহে কর্মরত অবস্থায় গুলিবিদ্ধ হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হন।

ঐ সময় কোন কোন স্বেচ্ছাসেবকদের পদযুগল উত্তপ্ত লবণ জলে ডুবাইয়া দেওয়া হয়। কোন কোন স্থলে নৃশংস পুলিশ অসহায় নারীর জরায়ুর মধ্যে ব্যাটন প্রবেশ করাইয়া দেয়।

ধীরে ধীরে এই আন্দোলন প্রশমিত হইতে আরম্ভ করিলে হরিজন আন্দোলন, অস্পৃশ্যতাবর্জন আন্দোলন বাড়িতে থাকে। নন্দীগ্রাম থানার বহু অঞ্চলে ইহা সার্থক হয়। এই আন্দোলনের মাধ্যমে নেতৃবর্গ দেশের সর্বস্তরের মানুষের অন্তর অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন ও স্বাধীনতার পথে জয় যুক্ত হইবার জন্য প্রেরণা দিতে থাকেন।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে 'না গ্রহণ না বর্জন' নীতি গ্রহণ করায় নন্দীগ্রামের জনসাধারণ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্র নাথের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে জয়যুক্ত করে। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস 'কর্মী সংঘ' নামে অভিহিত হইয়া খাল খনন, বাঁধ বাঁধা, খাদি প্রচার, নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদি গঠন মূলক কার্যে মনোনিবেশ করে। ঐ সময় বৃটিশ সরকার পল্লীপথে গাড়োয়াল্গি সৈন্য দিয়া 'রুট মার্চ' করিতেন ও 'ইউনিয়ন জ্যাক সেলুটশনের' ব্যবস্থা করে। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন ঘোষণ করে। ইহার ফলে কংগ্রেস কর্মীগণ নির্বাচনের প্রস্তুতি করিতে থাকেন। ঐ সময় ডাঃ গোবিন্দচন্দ্র ভৌমিক কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে তমলুক মহকুমা হইতে নির্বাচিত হন। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে সুভাষ চন্দ্র বসু কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হইলে তিনি নন্দীগ্রাম থানার চণ্ডীপুর গ্রামে আসিয়া সভা করিয়াছিলেন।

নন্দীগ্রামের গণসম্প্রদায় প্রত্যেক আন্দোলনে উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের সত্যাগ্রহেও প্রশংসনীয় অংশ গ্রহণে বাদ পড়েন নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে

যখন এশিয়ার প্রাচ্য অংশ ও ব্রহ্মদেশের শাসনভার ইংরাজের হস্তচ্যুত হইতে লাগিল এবং ভারত হইতেও কোন প্রকার সাহায্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া বৃটিশ শাসকদল স্বভাব সুলভ কুট-বুদ্ধির দ্বারা ভারতবর্ষ যুদ্ধনিরত দেশ বলিয়া প্রচার করিয়া এদেশের জনসাধারণের ব্যবহৃত সাইকেল, বন্দুক, নৌকা, মোটরবাস ও গো-যান প্রভৃতি নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে সরকারী নির্দিষ্ট স্থানে জমা প্রদান করিবার আদেশ করিল এবং বলপূর্বক ধান্যশস্য সংগ্রহ করিয়া সরকারী গুদামে সঞ্চিত করিতে লাগিল। কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ সকল পোড়াইয়া ফেলিয়াও ত্রাসের রাজত্ব বিস্তার করিল। বিষেশতঃ বিনাযুদ্ধে পলায়নের নীতি গ্রহণে প্রজাবৃন্দকে বিজেতার দয়ার নিকট পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাদপসরণের পূর্বাভাষ প্রকাশ করিতে লাগিল। মেদিনীপুরের এই অঞ্চল বঙ্গোপসাগরের সন্নিকট থাকায় প্রতি মুহূর্তে জাপানী আক্রমণের সান্নিধ্য নিকটতর মনে হইতে লাগিল। তমলুক মহকুমার কংগ্রেস কমিটি ইংরাজের অসহায় অবস্থা লক্ষ্য করিয়া জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা পান। তাহাতে জনসাধারণের রক্ষার জন্য ৫ হাজার সুশিক্ষিত যুবকের দ্বারা 'বিদ্যুৎবাহিনী' নামে এক স্বেচ্ছাসেবকদল গঠন করা হয়। এই সঙ্গে ৫০ জন শিক্ষিতা মহিলা দ্বারা 'ভগিনীসেনা' নামে একটি নারী স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীও গঠিত হইয়াছিল। উক্ত দলের মধ্যে নন্দীগ্রামের বহু যুবক সংশ্লিষ্ট ছিল।

ঐই সময় ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ৮ই আগষ্ট 'কুইট ইণ্ডিয়া' বা 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এদিকে বৃটিশ সরকার মেদিনীপুর জেলার রোডসেস নির্ধারণ পদ্ধতি সংস্কার করিতে উদ্যত হওয়ায় জনসাধারণ পূর্ব হইতে উত্তেজিত হইয়াছিল। সর্বত্র শোভাযাত্রা সভাসমিতি দ্বারা প্রতিবাদ চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে সরকার নন্দীগ্রাম থানার তেরপাখিয়া পারঘাটায় কয়েকখানি নির্দিষ্ট খেয়া-নৌকা ছাড়া অপর সমস্ত

নৌকা ও অন্যান্য যানবাহনাদি সমস্ত সরাইয়া লওয়ায় দেশের যানবাহন চলাচল একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। পোড়ান ইটের পাঁজাগুলি পর্যন্ত তাহার মালিকগণকে ব্যবহার করিবার নিষেধাজ্ঞা জারী হইল। কংগ্রেসের 'ভারতছাড়' আন্দোলনে সরকার নির্বিচারে মহাত্মা গান্ধী হইতে সমস্ত নেতৃবৃন্দকে ধৃত ও কারারুদ্ধ করিল। নেতৃহীন জনসাধারণ ক্রমে উত্তেজিত হইয়া থানা, বিচারালয় ও সরকারী অফিসগুলির সম্মুখে নানাপ্রকার ধ্বনিসহ শোভাযাত্রা ও সভাদির অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। কোথাও কোথাও দেশীয় সিপাহী-দের মনও স্বদেশীভাবাপন্ন হইয়া উঠিল। তাহারা একটি জনসভায় শ্রোতাগণের উপর লাঠি চালনা করিবার জন্য তমলুক মহকুমা শাসকের হুকুম অমান্য করায় জনসাধারণ আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। উত্তেজিত জনসাধারণকে পরিচালিত করিবার জন্য কারাগারের বাহিরে একজনও নেতা ছিলেন না। কাজেই জনতা ক্রমে ক্রমে নীতিভ্রষ্ট ও বিপ্লবের পথে অগ্রসর হইতে সুরু করিল। চৌকীদার ও দফাদারগণকে থানায় হাজিরা দেওয়া বন্ধ করা হইল। তাহাদের পোশাক, হুদ্দা কাড়িয়া লওয়া হইল। নন্দীগ্রামের ১৫নং ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্টের বাড়ী ঘেরাও করিয়া পঞ্চাইতির যাবতীয় কাগজপত্র পোড়াইয়া ফেলিল। এইরূপে উৎক্ষিপ্ত জনগণ সমগ্র ভারতের সরকারী যোগাযোগ রাস্তাঘাট, যানবাহন, সংবাদ প্রেরণের ভার প্রভৃতি নষ্ট করিয়া ১৯৪২ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে ইংরাজ সরকারের রেজিস্ট্রী অফিস, পোষ্ট অফিস, ডাকবাংলা, খাসমহাল, কাছারী, আদালত ও পুলিশ ষ্টেশনাদি আক্রমণ ও অগ্নিদ্বারা ধ্বংস করিয়া —খেয়া-নৌকা ডুবাইয়া—খালের পুল নষ্ট করিয়া ও বড় বড় রাস্তার উপর কর্তিতবৃক্ষ ফেলাইয়া পথ দুর্গম করিয়া তুলিল। ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে ১০ হাজার স্বদেশ প্রেমিক কয়েকজন যুবকের নেতৃত্বে নন্দীগ্রাম থানা আক্রমণ করিল। থানায় বড় দারোগা পূর্ব হইতে থানা ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে থাকায় সহকারী ছোট দারোগা

খন্দকার বর্বরের মত নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি বর্ষণে ৪ জনকে নিহত ও ১৬ জনকে আহত করে। হিন্দু-মুসলমানগণ পরস্পর এক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' ধ্বনি সহকারে চারিদিক হইতে দলে দলে সমবেত হইয়াছিল। নিহত সত্যাগ্রহিগণের মধ্যে বিহারীলাল হাজরা, আলাউদ্দিন, পরেশচন্দ্র বেরা প্রভৃতি বুকের রক্তে নন্দীগ্রামের ধূলি রক্তরঞ্জিত করিয়া স্বাধীনতার ইতিহাস বক্ষে পুলিশের দানবীয় অত্যাচারের অক্ষুণ্ণ স্মৃতি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছে। এইরূপ দাসবৃত্তির পাতুকালেহী দৃষ্টান্ত তমলুক, মহিষাদল, সুতাহাটা ও ভগবানপুর প্রভৃতি মেদিনীপুরের বহু থানায় অনুষ্ঠিত হইতে বাদ পড়ে নাই। কর্মীগণ অহিংস না হইয়া সহিংস নীতির অনুসরণী হইলে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সেই সব পশ্বাধম দুশ্চরিত্র পাষণ্ডের দলকে ফাঁসিকাষ্ঠে লটকাইয়া অথবা আকণ্ঠ মৃত্তিকা প্রোথিত করিয়া শার্দ্দুল সমক্ষে সংস্থাপনে উপহৃত করিতে ভুলিতেন না। বিজিত দেশপ্রেমিকদল পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয়। তাহারা ফিরিবার পথে আবগারী দোকান, ঋণ-সালিশী বোর্ড অফিস, পোষ্ট অফিস ও মহিষাদল জমিদারীর রেয়েপাড়া কাছারীতে অগ্নি সংযোগে করিয়া ভস্মীভূত কর।

পরবর্তীকালে বৃটিশ সেনাদল গ্রামে গ্রামে প্রবেশ করিয়া স্বদেশ প্রেমিকগণের গৃহদাহ ও অবাধ লুণ্ঠন আরম্ভ করে। বহুস্থানে গুলি চালাইতে ও কুলরমণীগণের শ্লীলতা হানি ও পাশবিক অত্যাচার করিতে পশ্চাদপদ হয় নাই। তমলুক মহকুমার ২২টি স্থানে গুলি চালাইয়া ৪৪ জনকে হত্যা ও ৩৪১ জনকে আহত করে। ৬৩ জন স্ত্রীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচার করে। অত্যাচারের ফলে ২জন স্ত্রীলোকের ঘটনাস্থলে মৃত্যু ঘটে। পুনরায় ৩১ জন স্ত্রীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচার করিবার চেষ্টা করা হয়। ১৫০ জন স্ত্রীলোককে প্রহার ও শ্লীলতাহানি করা হয়। এই সময়ে ৪,২২৬ জন প্রহৃত, ১,৮৬৮ জন গ্রেপ্তার ৯ জন

ভারত রক্ষা আইনে আটক ও ৪০১ জন স্পেশ্যাল কনেষ্টবলরূপে কার্য করিতে বাধ্য হয়। ১২৪ খানি গৃহ ভস্মীভূত ও ৪৯ খানি গৃহের ক্ষতি সাধন ও ১৩,৭৩০ খানি গৃহ খানাতল্লাসী করে। ২৭ খানি বাড়ী দখল করে। জনসাধারণের ক্ষতির পরিমাণ ১,৪৭,৫৭৫৲ টাকা। ৫৮টি পরিবারের ২৫,৩৬৫৲ টাকা মূল্যের সম্পত্তি ক্রোক কবা হয়। ৫টি ইউনিয়নে মোট ১,৯০,০০৲ টাকা পাইকারী জরিমানা করা হয় ও ১৯টি প্রতিষ্ঠান বে-আইনী ঘোষিত হয়।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দর আগষ্ট আন্দোলনে থানা কংগ্রেস সভাপতি সুধাংশু শেখর ভূঞা, সম্পাদক কৃষ্ণপদ বেরা প্রভৃতি প্রথমে কারারুদ্ধ হন। ঐ সময় যে সকল কর্মী নেতৃত্ব করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সতীশ চন্দ্র সাহ, কুঞ্জবিহারী ভক্ত দাস, রাজেন্দ্র নাথ ভূঞা, অমূল্য রতন ভৌমিক, শ্রীবাস দাস প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য। ঐ সকল ব্যক্তির নেতৃত্বে থানা আক্রমণ, অত্যাচারীদের শাস্তি বিধান প্রভৃতি কার্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। যখন মেদিনীপুরেব তমলুকে কুমার চন্দ্র জানা, সতীশ চন্দ্র সামন্ত, অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়, সুশীল চন্দ্র ধাড়া প্রভৃতির উদ্যোগে 'জাতীয় সরকার' গঠিত হইল তখন এই সব কর্মীগণ নন্দীগ্রাম থানায় তাহার সার্থক রূপায়ণ করিতে থাকেন। ছাত্র কর্মী হিসাবে প্রবোধকুমার ভৌমিক তেখালিবাজার, টাকাপুরা প্রভৃতি স্থানে সভা করেন ও পরে কলাগেছিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের একদল ছাত্রকে লইয়া কাঁথির পথে রওনা হন। সেইখানে তিনি গ্রেপ্তার হন। এই আন্দোলন চরম আকার ধারণ করিলে পুলিশ এই থানায় নৃশংস অত্যাচার করিতে থাকে।

এই সকল অত্যাচারের প্রতিরোধকল্পে স্বদেশ সেবকগণ পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করেন, কিন্তু সর্বশাস্তিময়ের শুভাশিস অদৃষ্টের পরিহাসাকারে ১৬ই অক্টোবর বাংলা ২৯শে আশ্বিন শারদীয়া সপ্তমী তিথিতে বন্যা-ঝটিকা সাইক্লোন আকারে সমাগত হইয়া ধ্বংসের তাণ্ডবলীলায় এক নূতন যুগের আবির্ভাব সূচনা করে। ইংরাজ

কর্মচারিগণ এই আবহাওয়ার সংকেত বার্তা জানিয়াও জন-সাধারণকে সতর্কতার ইঙ্গিত প্রদান করে নাই। নন্দীগ্রামের ১৩, ১৫, ৭নং ইউনিয়ন তিনটি ও ১৪নং ইউনিয়নের অধিকাংশ স্থান অতি বিধ্বস্ত হইয়াছিল। বালেশ্বরের প্রান্তভাগ হইতে সুতাহাটা পর্যন্ত উপকূলান্তর্বর্তী মেদিনীপুর জেলার দুর্দশা বর্ণনাতীত। উচ্ছ্বসিত বন্যাস্রোতে ভাসমান অবস্থায় গৃহচালাগুলি তৃণপুঞ্জের মত খণ্ড খণ্ড হইয়া নিশ্চিহ্ন ও মৃত্তিকায় দেওয়ালগুলি বালুকা স্তূপের মত চতুর্দিক বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সর্বগ্রাসী মহাপ্লাবনের সংবাদ কয়েক দিন সরকার পক্ষ কাহাকেও জানিতে বা জানাইতে দেয় নাই। কয়েক দিনের পর সংবাদ প্রচারিত হইলে বন্যাপীড়িত বুভুক্ষু আর্তের সেবার জন্য কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য দানের অনুমতি দেওয়া হয় নাই। বাংলার স্পর্ধিত সিংহ ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রতিবাদের চাপে পড়িয়া শক্তির কার্পণ্য প্রকাশে হীনচেতা ইংরাজ সরকার রাজ-কর্তব্যের অপবাদ মুক্তির জন্য সাহায্যের মুষ্টিভিক্ষা বিতরণে বাধ্য হইয়াছিল। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশন, হিন্দুমহাসভা, মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটি, বঙ্গীয় সংকটত্রাণ সমিতি মহেন্দ্র রিলিফ কমিটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য বিতরণের জন্য আবশ্যক পরিমিত খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রাদিলাভের সুযোগ সরকার প্রদান করে নাই। অখাদ্যে-কুখাদ্যে ম্যালেরিয়া, কলেরার মহামারীতে বীভৎস শ্মশান দৃশ্য পল্লীমধ্যে পরিদৃশ্য হইতে লাগিল। দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নরনারী পথে-ঘাটে পতিত হইয়া মৃত্যু বরণ করিতে লাগিল। শৃগাল-শকুনির দল শবদেহের সৎকার করার অবাধ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াও অত্যধিক প্রাচুর্যের ফলে নিস্পৃহ ও অরুচিতে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতে লাগিল। চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত নরকঙ্কাল শঙ্খ শুভ্র অলঙ্কারের মত শেষ বিরাম দায়িনী শ্মশান মাতৃকার বক্ষ পরিশোভনে আতঙ্কের অপূর্ব ভীতি সৃষ্টি করিল।

শোষক সরকার লঙ্গরখানার প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রজাপালনের এক

বিচিত্র উপন্যাসের অভিনয় করিয়া গিয়াছে। বহু শতাব্দী বহু যুগ-যুগান্তর তাহার অভূতপূর্ব কীর্তিকাহিনী ইতিহাস জগতে চিরদীপ্ত থাকিবে।

এই দুর্দিনের সমাগমে বিদেশী বণিকেরা জোর আমলাতন্ত্র শাসন-ভীতির শিথিলতা প্রদর্শন করে নাই। পুলিশবাহিনী নন্দীগ্রামের গ্রামে গ্রামে সফর করিয়া জাতীয় সরকারের কর্মী, সাহায্যকারী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের অনুসন্ধান করিতে থাকে এবং আগষ্ট বিপ্লবের সত্যাগ্রহীগণকে ধৃত ও বেত্রাঘাত করতঃ দণ্ডের নামান্তরে উৎকোচ গ্রহণেরই ব্যবসা আরম্ভ করে। এইভাবে কিছুদিন অবাধ অরাজ-কতার অভিনয় চলিতে থাকে। থানা আক্রমণকারী স্বদেশসেবী শহীদগণের উপর গুলি নিক্ষেপকারী পাষণ্ড 'খন্দকার' এবারেও শাসন বেত্র হস্তে নন্দীগ্রামের বুকে নৃসংশতার অভিনয় দেখাইতে ঘৃণাবোধ করে নাই। ঐ সময় দেশের একদল লোক কালাবাজারে লিপ্ত হইয়া দেশকে ধ্বংস করিতে থাকে। কিন্তু আমলাতন্ত্রের সমূহ প্রচেষ্টা এইবার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। নিতান্ত নিরুপায় দৃষ্টে বণিকরাজ জনগণের স্বাধীনতার দাবী স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। উহারা ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের যেই আগষ্ট মাসে এদেশের শাসনদণ্ডে হস্তক্ষেপ করিয়া ছিল ১৯৪৭ এর ১৫ই আগষ্টের মিলন বিচ্ছেদী সন্ধিক্ষণে দ্বিধা বিভক্ত, ভারতের হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান রাজ্য বৈমাত্রেয় ভ্রাতা দেব দানবের বৈরিতা লইয়া অশুভলগ্নে বিদেশী শাসন শৃঙ্খল মুক্ত হইয়াছে।

২

প্রাচীন কীর্তি কাহিনী

রুক্মিণীদেবী ও রাখাল দ্বীপা

মালজেঠিয়াগড় প্রতিষ্ঠাতা রাজা রুক্ম কর্তৃক খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রক্মিণীদেবী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে ব্রজলালচকের মালজেঠিয়া গড়ের অদূরে গো-চারণ মাঠে বহু দিবস হইতে একখণ্ড প্রস্তর পতিত ছিল। রাখাল বালকগণ ঐ প্রস্তর খণ্ডের উপর বসিয়া বিশ্রাম করিত। একদিন উহারা বালস্বভাব ক্রীড়াচ্ছলে পূজার অভিনয় করিবার উদ্দেশ্যে ঐ প্রস্তর খণ্ডটিকে দেবীরূপে স্থাপন করিয়া পূজাকার্যে ব্রতী হয়। রাখালগণের মধ্যে কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ বাদ্যকর, কেহ গায়ক, কেহ হন্তকার—ইত্যাদির ভূমিকা গ্রহণ করে। এইরূপে ১৬ জন বালকের মধ্যে শেষোক্ত বালকটি বলির পশুরূপে নির্দিষ্ট হয়। পূজারন্তে শেষোক্ত বালকটিকে যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া হন্তকার বালকটিকে একটি কাষ্ঠ খণ্ড দ্বারা আঘাত করিবামাত্র বালকটির মস্তক ছিন্ন হইয়া যায়। অসম্ভব ব্যাপার দর্শনে অন্যান্য রাখাল বালকেরা ভীত হইয়া আত্মগোপন করে। গৃহস্বামীগণ প্রত্যাগত গো-পালের সঙ্গে রাখাল বালকগণকে অনাগত দেখিয়া খোঁজ খবর লইবার জন্য গো-চারণ মাঠে গিয়া এই বীভৎস ব্যাপার দর্শন করেন। জনরবে ঘটনা প্রচারিত হওয়ায় শত শত ব্যক্তি ঘটনাস্থলে উপনীত হন। পরে রাত্রিতে গৃহস্বামীগণ গৃহাগত হইয়া আপন আপন আশ্রিত নিরুদ্দিষ্ট রাখাল বালকগণকে দেখিতে পাইলেন। বলি প্রদত্ত বালকটিও উহার প্রতিপালক গৃহে সমাগত হইয়াছে। পরদিন সেই সংবাদ রাজা রুক্মের কর্ণগোচর

হওয়ায় তিনি সেই প্রস্তর খণ্ডটি প্রতিষ্ঠিত করেন। তৎকালে এদেশে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব ছিল। সেইজন্য তিনি কান্যকুব্জ প্রদেশের বগলা প্রসাদ মিশ্র বেদাচার্যকে আনাইয়া দেবীর প্রতিষ্ঠা কার্যে নিযুক্ত করেন। তদবধি রাজা রুক্ম প্রতিষ্ঠিত সেই দেবী রক্মিনী দেবী নামে ও রাখাল বালকগণের পূজাভিনয়ের স্থানটি 'রাখাল দ্বীপা' নামে অভিহিত রহিয়াছে। 'রঙ্কিণী চরিত' নামক একখানি প্রাচীন তালপত্রের পুঁথিতে উড়িয়া ভাষায় এই কাহিনী লিপিবদ্ধ ছিল। কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের দেবদেবীর বন্দনা সঙ্গীতের রক্মিণী নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

'মালঝাটা গড় বন্দ মহলা রক্মিণী।
১৬ শ রাখাল খেযে সেজেছ ডাকিনী॥'

এদেশের অনভিজ্ঞ গায়কগণ ১৬শ (ষোড়শ বা ষষ্ঠদশ) শব্দটিকে যো৯শ' বলিয়া উচ্চারণ করেন; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহা ষোড়শ উচ্চারিত হইবে।

উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় রাজাগণের পতনের পর দীর্ঘকাল মালজেঠিয়ায় অরাজকতা বিদ্যমান ছিল। গুমাইগড়ের রাজা কল্যাণরায় রক্মিণীদেবী কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া মালজেঠিয়া অধিকার করেন ও দেবীর পূজার ব্যবস্থা করেন। প্রবাদ আছে রাজা দেবীর সন্তোষ বিধানার্থে নরবলি প্রদান করিতে না পারায় শেষে আত্মবলি দান করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে এই রাজ্য মহিষাদলের উপাধ্যায় বংশের রাজা রাজারামের অধীনে যাওয়ায় তদীয় পুত্র শুকলাল উপাধ্যায় পুত্রকামনায় সপত্নীক দেবীর নিকট আগমন করেন ও প্রার্থনা জানাইয়া যান। পরে রাজার পুত্র হওয়ায় সেই পুত্রের নাম আনন্দলাল রাখেন এবং দেবীর শারদীয়া পূজার জন্য বার্ষিক ৩৯৲ টাকা হিসাবে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করেন। তৎপর রাজা আনন্দলালের পত্নী রাণী জানকীদেবী দেবীর সেবা পূজার জন্য দেবীর সেবাইৎ স্বামী

বগলা প্রসাদ মিশরের (মিশ্রের) বংশধর অভিরাম বিদ্যালঙ্কারকে ৪/০ জমি ব্রহ্মোত্তর সনন্দ *প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

রুক্মিণীদেবীর মন্দিরের দ্বার পূর্বদিকে ছিল। রসিকাচক গ্রামের মোহনলাল ভুঞ্যা দেবীর নির্দেশক্রমে দেবীর নিকট গান করিবার জন্য উপনীত হইয়া জনসাধারণের নিকট উপেক্ষিত হওয়ায়, মন্দিরের পশ্চাদভাগে গান আরম্ভ করেন। সহসা দেবীর মন্দির দ্বার রুদ্ধ হইয়া পশ্চাদভাগের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়ে ও সকলে দেবীকে পশ্চিমমুখিনী দেখিতে পান। তদবধি দেবী পশ্চিমমুখিনী আছেন।

চোড়ং রাজ বাসুদেব

বিগত একাদশ শতাব্দীতে অনন্তবর্মা চোড়ঙ্গদেব উড়িষ্যার কেশরী বংশের উচ্ছেদ সাধন করিবার পর একদিন অরঙ্গানগর পরগণার ব্রজলালচকের মালজেঠিয়াগড়ে আগমন করেন।

---

* (সনন্দ প্রতিলিপি)

শ্রীশ্রীরাম।

মৌয়াজি ৪/০ বিঘা জমি ব্রহ্মোত্তর দিলাম সন ১১৮২ সাল
গৌড়াদ্য বৈদিক শ্রীযুক্ত অভিরাম বিদ্যালঙ্কার মিশ্র অধিকারী—
শ্রীচরণেষু।

ব্রহ্মোত্তর সনন্দ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে।
আমার জমিদারী পরগণা অরঙ্গানগর ব্রজলালচক মৌজায় মৌয়াজি ৪/০ বিঘা জমি মাফিক-তপশীল জমিন তোমাকে ব্রহ্মোত্তর দিলাম। জমি জোতিয়া জোতাইয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগ করহ। অপর কোন দায় নাই। এতদার্থে ব্রহ্মোত্তর দিলাম। ইতি।
সন ১১৮২ সাল তাং ৯ই শ্রাবণ।

মন্ত্রী
শ্রীকরুণাময় দাস।

সহকারী মন্ত্রী লিপিকার।
শ্রীগৌর চন্দ্র দাস

স্বাক্ষর (দেবনাগরাক্ষরে)
শ্রীরাণী জানকী দেবী
মহিষাদল।

দণ্ডপাটাধিপতি বিনাযুদ্ধে সন্ধিস্থাপন করায় চোরঙ্গদেব প্রত্যাবৃত্ত হন। তিনি তৎকালে মালজেঠিয়ায় বিষ্ণুমূর্তি প্রাপ্ত না হওয়ায় উড়িষ্যা হইতে প্রস্তর খোদিত এক বিষ্ণু মূর্তি আনাইয়া এই স্থানে স্থাপন করাইয়া যান। দুর্ধর্ষ কালাপাহাড় উড়িষ্যা অভিযান কালে এই আন্তঃপ্রাদেশিক দণ্ডপাটে সর্ব প্রথম এই দেব মূর্তি ভগ্ন ও মন্দির ধ্বংস করিয়াছিল। তদবধি ঐ ভগ্ন দেবমূর্তি—মালজেঠিয়ার এক প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে পতিত রহিয়াছে। মূর্তিটি ৪´।১০´´ × ২´।৬´´ × ১´ ফুট প্রস্তরে নির্মিত হইয়াছিল। স্থানীয় অধিবাসিগণ উহাকে চোড়ং রাজ বাসুদেব মূর্তি বলিয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে উহা শ্রীধর মূর্তি। অদ্যাপি ও স্থানীয় অধিবাসিগণ পুত্র কন্যাদের বিবাহ সময় ঐ ভগ্ন দেবমূর্তির অঙ্গে তৈল-হরিদ্রা দান করিয়া পশ্চাৎ বর ও কন্যার গাত্রে হরিদ্রা প্রদান করেন।

মছন্দলী ভেড়া ও জগনাথদেব

প্রাচীন মালজেঠিয়ায় রথযাত্রা উৎসব প্রচলিত ছিল। রথ চালনার ধ্বংসপ্রাপ্ত পথটিকে দেশবাসীরা মছন্দলী ভেড়া বলিয়া থাকে।

এখানকার জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা মূর্তিত্রয় মহিষাদলের উপাধ্যায় বংশীয় রাজা মতিলাল উপাধ্যায় নিজগড়ে স্থানান্তরিত করিয়া রথনির্মাণ করতঃ মহিষাদলে রথোৎসব প্রচার করিয়াছেন। গড় মালজেঠিয়ার গড়বাড়ী, কালিদহ পুকুর, কামান দীঘি, রুক্মিণী কুণ্ড, শোণিত কুটি ও মছন্দলী ভেড়া প্রভৃতি অতীত স্মৃতিগুলির ধ্বংসাবশেষ নিদর্শনের মধ্যে উল্লেখযোগ্যমাত্র। গড় আবেষ্টিত পরিখাটি জল, জমিতে রূপান্তরিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাইয়তগণের দখলে গিয়াছে।

রায়াপাড়ার শিবমন্দির

হিজলী টাইডেল ক্যানেলের পশ্চিম পার্শ্বে রায়াপাড়া নামক স্থানে এই শিব মন্দির ও তাহার অদূরে পশ্চিম পার্শ্বে কালী মন্দিরটি অবস্থিত। শিব মন্দিরের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে প্রাচীন গীত-কবি রামেশ্বর

ভট্টাচার্য মহাশয় উক্তি করিয়াছেন যে, বাণিজ্য যাত্রাগামী চন্দন সদাগর এই মন্দির নির্মাণ ও দেবতার প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। দেখিয়া মনে হয় শিব মন্দিরটি বেশ প্রাচীন কিন্তু কালী মন্দিরটি তাহার সমসাময়িক নহে।

প্রবাদ আছে সদাগর কর্তৃক নিযুক্ত বিশ্বকর্মা দেবতার নির্দেশ মত এক রাত্রির মধ্যে মন্দিরের নির্মাণ কার্য সম্পাদনের পূর্বেই বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় উহা অসম্পন্ন রহিয়া গিয়াছে। কারণ মন্দির নির্মাণ কার্য কোন মনুষ্য কর্তৃক পর্যবেক্ষণ করিবার নিষেধাজ্ঞা ছিল। সদাগর তন্দ্রাঘোরে প্রভাত কাল ধারণা করিয়া শয্যাত্যাগে বহির্গত হওয়ায় অসমাপ্ত মন্দির শীর্ষ হইতে তাহা বিশ্বকর্মার লক্ষ্যে পড়ে। বিশ্বকর্মা সদাগরকে মন্দির সমীপে আসিতে দেখিয়া মন্দির হইতে অবতরণের জন্য দুই খণ্ড তালবৃন্ত পায়ে বাঁধিয়া নিম্নে লম্ফ প্রদান করেন। লম্ফ প্রদানের পর পতিত ভূমির চতুষ্পার্শ্বের মৃত্তিকাসহ বিশ্বকর্মা পাতাল প্রবেশ করায় সঙ্গে সঙ্গে তাহা সুগভীর খাত জলপূর্ণ হইয়া উঠে, তাহাই বর্তমান তালপুকুর নামে অভিহিত রহিয়াছে। সদাগর সেই অসমাপ্ত মন্দিরে মহাদেবের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মন্দির শীর্ষটি খুব সম্ভব কালাপাহাড়ীয় যুগে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল।

এই মহাদেবের সেবাইতগণ তারকেশ্বরের মোহান্ত কর্তৃক নিযুক্ত ও তদীয় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইতেন, বর্তমান সেবাইতগণ নিজ নিজ শিষ্যগণের মধ্যে উত্তরাধিকারিত্ব অর্পণ করিয়া থাকেন। দেবতার সেবা পূজার জন্য বহু ভূসম্পত্তি রহিয়াছে, কিন্তু ঐ সকল সম্পত্তির কোন সনন্দ বা দান পত্রাদির নিদর্শন না থাকায় প্রদাতার পরিচয় অন্ধকারাচ্ছন্ন রহিয়াছে।

এই মন্দিরের অসমাপ্ত অংশ কৃষ্ণনগর গ্রামের ৺রামনারায়ণ গিরি মহাশয় সম্পন্ন করিয়া দিয়াছেন। প্রতি বৎসর শিব চতুর্দশীর সময় শিবব্রতাবলম্বী স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সহস্র সহস্র ব্রতীগণ দেবতার নিকট দীপমালা ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদানে এবং পঞ্চামৃত পানে ব্রত

উদ্‌যাপন করেন। প্রায় সপ্তাহকাল মহাসমারোহে দেবতার পূজা ও মেলা বসিয়া থাকে। চৈত্রমাসে গম্ভীরা বা গাজন উৎসবে বহু ভক্ত সন্ন্যাসী সম্মিলিত হইয়া উপবীত গ্রহণ, বন-উৎসব ও চড়ক পূজাদি করিয়া থাকেন। এই সময় একদিনের মত একটি বৃহৎ মেলা চড়ক ডাঙ্গায় বসিয়া থাকে।

শিব মন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বেই কালী মন্দির। প্রতি বৎসর দীপান্বিতা অমাবস্যা রাত্রিতে দেবীর পূজা হইয়া থাকে। পূর্বে এই সময় মহিষ বলি প্রদানের প্রথা ছিল।

বড়ামচণ্ডী *বড়াম দীঘি ও মোহিনী দীঘি

অরঙ্গানগর পরগণার কুলবাড়ী মৌজায় বড়ামচণ্ডী ও বড়ামদীঘি বিদ্যমান। মহিষাদলের অতীত রাজবংশের রাজা কল্যাণরায়েব জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা কাশীরাম রায় কর্তৃক এই দেবী ও দীঘি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং উহা ঐ বংশের আদি পুরুষ বড়িয়া রায়ের নামে উৎসৃষ্ট হইয়াছিল। রাজা কাশী রায়ের পত্নী রাণী মোহিনীদেবী কর্তৃক ঐ পরগণার নন্দপুর মৌজায় প্রায় শতাধিক বিঘা ভূমিব উপর প্রতিষ্ঠিত জলাশয়টি অদ্যাপি মোহিনীদীঘি নামে পরিচিত আছে। কাশীরাম অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করায় তদীয় ভ্রাতা হৃদয়রাম রাজা হইয়া তেরপাড়া পরগণায় একটি সুবৃহৎ জলাশয় খনন করিয়াছিলেন। উহা হৃদয়রামের বা হিদারামের পুকুর নামে পরিচিত। রাজনগর ও রাণীর হাট প্রভৃতি স্থানগুলিও এই বংশের বংশধরগণের পরিসৃষ্ট। পরবর্তীকালে রাজা গুকলাল উপাধ্যায় উক্ত বড়ামচণ্ডীর বার্ষিক বৃত্তি বাইশ টাকা একআনা হিসাবে প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

---

* পশ্চিম মেদিনীপুরে বড়ামচণ্ডী বা বড়াম পূজার প্রচলন বেশী। তাহাতে পোড়ামাটির হাতি, ঘোড়া দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। ইহার সংগে তাহার কোন সাদৃশ্য নাই।

বামুন আড়া বা বর্ধমান শীতলা

সুজামুঠা পরগণার বামুনআড়া গ্রামের প্রাচীন শীতলাদেবী সাধারণতঃ বামুনআড়া শীতলা বা বর্ধমান শীতলা নামে পরিচিত। কিংবদন্তী ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে বামুন আড়া বাড় কস্‌বা নিবাসী মাধব কর নামক জনৈক ধনশালী ব্যক্তি দেবী কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হন, 'আমি পাষাণ রূপে তোমার পুষ্করিণী মধ্যে অবস্থিত আছি। তুমি আমাকে পুকুর হইতে উত্তোলন করিয়া আমার পূজার ব্যবস্থা কর।' পরদিন প্রাতঃকালে ঐ ব্যক্তি আপনার পুরোধা গৌড়াদ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভগবান পতিকে আনাইয়া প্রস্তরময়ী দেবীকে উত্তোলন করতঃ পূজার ব্যবস্থা করিয়া দেন এবং উক্ত ব্রাহ্মণকে দেবীর সেবাইৎ নিযুক্ত করেন। সংবাদ ক্রমে ক্রমে চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হওয়ায় দিন দিন জন সমাগম বর্ধিত ও দেবীর মহিমা ঘোষিত হইতে থাকে। সুজামুঠার রাজা মহেন্দ্র নারায়ণ রায় দেবীর সেবা পূজার জন্য প্রচুর ভূসম্পত্তি জায়গীর দিবার ইচ্ছা করেন। কিন্তু দেবীর নিষেধ আজ্ঞায় উহা গৃহীত হয় নাই। তাহাতে রাজা দেবীর নিকট অপরাধ মার্জনা প্রার্থনা করায়, কেবলমাত্র দেবীর অন্নভোগের লবণ সরবরাহের মত মাত্র পঁচিশ কাঠা ভূমি নিষ্কর প্রদানের অনুমতি প্রাপ্তে তাহাই দেবীর উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেন। পরে দেবীর ইচ্ছাক্রমে দেবীকে মাধব করের বাড়ী হইতে বামুন-আড়ার শ্মশান ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। পরবর্তীকালে অরঙ্গানগর পরগণার দামোদরপুর গ্রামের অভয় গিরি নামক ব্যক্তি দেবীর আদেশ ক্রমে দেবীর প্রসাদ বিক্রয় লব্ধ অর্থ দ্বারা মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ভক্তবৃন্দের মনস্কাম সিদ্ধের জন্যই দেবী বর্ধিত মান প্রাপ্ত হইয়া বর্ধমান নামে অভিহিত হইয়াছেন বলিয়া অনেকের ধারণা। প্রতি বৎসর মকর সংক্রান্তি, বৈশাখ সংক্রান্তি ও অক্ষয় তৃতীয়া ও শারদীয়া নবমী উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজার আয়োজন ও তদুপলক্ষে বৃহৎ মেলার অনুষ্ঠান

হইয়া থাকে। বৈশাখ সংক্রান্তির মেলা চারি দিন স্থায়ী হয়।

বাশুলী দেবী

নন্দীগ্রাম থানার কয়েকটি স্থানে বাশুলী দেবীর অবস্থান দৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রত্যেক স্থানের দেবী ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণে বিশেষিতা আছেন। যথা—বাশুলীচকের টঙার বা তুঙ্গার বাশুলী, গাংড়ার বনবাশুলী, চন্দননগরের খুঁড়ি বাশুলী ও ৭নং জালপাইর চক বাশুলী প্রভৃতি। কিন্তু বিশেষণ বর্ধনে বাশুলী দেবীর নামোল্লেখ করিলেই একমাত্র বাশুলীচকের তুঙ্গার বাশুলীই জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে।

গুমগড় পরগণার পূর্বোত্তর প্রান্তে হলদী নদীর মোহনার নিকটবর্তী স্থানে দেবীর অতীত মন্দিরটি অবস্থিত ছিল। উহা মহিষাদলের উপাধ্যায় বংশের রাণী জানকীদেবী কর্তৃক অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তঃভাগে নির্মিত হইয়া ছিল। দেবীর সেবাপূজার জন্য রাণী কর্তৃক অর্পিত বিশাল ভূমিভাগ পরবর্তী কাল হইতে বাশুলাচক আখ্যায় অভিহিত রহিয়াছে।

দেবীর আবির্ভাব সম্বন্ধে পণ্ডিত ভগবতী প্রধান কৃত মহিষাদল রাজবংশ ও তৎপর মেদিনীবাণী নামক মাসিক পত্রিকায় যে আখ্যায়িকা বর্ণিত হইয়াছে তাহা এইরূপ। দেবী নিজেকে নিরাশ্রয়া ব্রাহ্মণবালিকা পরিচয়ে ঐ স্থানের জনৈক জালিকের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জালিক দম্পতিকে পিতামাতা সম্বোধন করেন। উহাদের গৃহে দেবীর অবস্থানে উহাদের অবস্থার অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটে এবং সেই সংবাদ দেশাধিপতির শ্রুতিগোচর হওয়ায় তিনি সেই জালিক আশ্রিতা বালিকাকে গড়মধ্যে আনয়ণ জন্য পাইক প্রেরণ করেন। জালিক, পাইক সর্দারের নিকট জ্ঞাত হইল যে, যদি সহজভাবে বালিকাকে প্রদান করা না হয় তাহা হইলে

বলপূর্বক গ্রহণ করা হইবে। তখন জালিক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বালিকাকে রাজার নির্দেশ গোচর করায় বালিকা মৃদুহাস্যে রাজাজ্ঞা পালনের সম্মতি প্রকাশে বস্ত্র পরিবর্তন করিবার ছলে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর বহির্গত হন নাই। পাইক সর্দার বালিকার বিলম্ব দৃষ্টে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করে ও তথায় বালিকার প্রস্তরীভূত মূর্তি দর্শনে ভয়ে ও বিস্ময়ে রাজার নিকট ফিরিয়া আনুপূর্বিক ঘটনা প্রকাশ করে। এদিকে জালিক দম্পতি* ঐ পাষাণ প্রতিমা গঙ্গায় বিসর্জন দিয়া বালিকার বিরহে প্রাণত্যাগ করে। অতঃপর কোন ব্রাহ্মণ স্বপ্নযোগে গঙ্গাগর্ভে দেবীর আবিভাব দর্শনে তদীয় উদ্ধার সাধন ও অভিলষিত স্থানে স্থাপন করতঃপূজার ব্যবস্থা করেন।

ঐতিহাসিক সময়ের দিক লক্ষ্য করিলে দেবীর আবির্ভাব কাল সপ্তদশ শতাব্দীর অন্তর্বর্তী হইবে এবং এইস্থানের উদ্ভব কাল ষোড়শ শতাব্দীর অন্তকাল বলিয়া মনে হয়। কারণ সপ্তদশ শতাব্দীতে গড়চক্রবেড়িয়া জমিদারী প্রতিষ্ঠার সময় এই অঞ্চল জনবসতি বিরল ও জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। তৎপূর্বে এতদ্দেশে কোন দেশাধিপতির বাসস্থান দৃষ্ট হয় নাই। গুমগড় পরগণাটি মহিষাদল রাজ বংশের অধিকারে ছিল। হিজলীর তাজখাঁ মসনদ ই আলা বালেশ্বর সরকারের শাসনকর্তা হইয়া মহিষাদল রাজ্য বিজয় করেন এবং মহিষাদল হইতে গুমগড় পরগণাটি বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া তাহা স্বীয় সেনানায়ক ব্রজগোপাল চৌধুরীকে ইনাম প্রদান করায় ব্রজগোপাল এতদ্দেশের দেশাধিপতি হইয়া চক্রবেড়িয়া গ্রামে তাঁহার জমিদারী গড় প্রতিষ্ঠা করেন।

এতদ্বারা উপরি উক্ত আখ্যায়িকার নায়ক ব্রজগোপাল বা তাঁহার পরবর্তী পুরুষ হইবেন। গড়চক্রবেড়িয়ার ধ্বংস প্রাপ্ত

বাশুলীচকের সন্নিহিত জালিয়া মারা বা জেলেমারা নামকরণ ঐ জালিক দম্পতির অকাল মৃত্যুর নিদর্শন হইতে অভিহিত হওয়া সম্ভব।

গড় মধ্যে এখনও একটি স্থান বাশুলীপতা নামে অভিহিত রহিয়াছে। বাশুলী দেবীর সেবাইত বংশের জনৈক অভিজ্ঞ সেবাইতের নিকট জানা যাইতেছে বাশুলীদেবী আদিতে চৌধুরীদের কুলদেবী ছিলেন। দেবীর প্রতিষ্ঠার সময় চৌধুরী রাজা নিষ্ঠাবান ও বেদজ্ঞব্রাহ্মণ পণ্ডিত কাশীনাথ শাস্ত্রী সিংহটালের পরিচয় প্রাপ্তে তাঁহাকে মেদিনীপুরের সন্নিকট নারা নামক স্থান হইতে আনাইয়া প্রতিষ্ঠা কার্য সমাধার পর তাঁহারই হস্তে দেবীর অর্চনার ভার ন্যস্ত করেন। অধিকন্তু তাঁহার পরিজনবর্গকে আনাইয়া স্বীয় জমিদারী মধ্যে হরিপুর গ্রামে কিছু ভূসম্পত্তি ব্রহ্মোত্তর প্রদান করিয়া বসবাস করান। উক্ত ব্রহ্মোত্তর ভূমির দান পত্রের কোন প্রামাণ্য নিদর্শন নাই।

'চৌধুরী চরিত' নামক পুঁথিতে দেখা যাইতেছে দুর্গাপ্রসাদ বিদ্রোহী হইয়া মহিষাদলের রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারী পাইক গনকে হত্যা করিয়া সুজামুঠা রাজ্যে পলায়ন করায় অরক্ষিত গড়-চক্রবেড়িয়া গড় মিলিত নবাব সৈন্যসহ মহিষাদল সৈন্যের আক্রমণ কবলিত হইবার দুঃসংবাদে রাণী ধনরত্ন পরিজন সহ গোপনে প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া হলদীনদীর মোহনার সন্নিকটে চরভূমির উচ্চ অরণ্য-ময় স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিধর্মীদের সংস্পর্শ হইতে পবিত্রতা রক্ষার জন্য রাণী কর্তৃকই দেবী স্থানান্তরিত হইয়াছিল বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

এইভাবে দেবী গড়চক্রবেড়িয়া হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন এবং নদীতরস্থ চরভূমির জঙ্গলাকীর্ণ তুঙ্গ অর্থাৎ উচ্চস্থানে স্থাপিত হইবার পর পরবর্তীকাল হইতে তুঙ্গ-বাশুলী বা টুঙ্গারবাশুলী নামে অভিহিতা হইয়াছেন।

দেবীর স্থানান্তরিতের পর হইতে ক্রমাগত দেবীর অত্যাশ্চর্য প্রভাব দৃষ্টে দেশ বিদেশাগত যাত্রী ও পণ্যবাহী নৌকার আরোহী-গণ বাশুলীদেবীর নাম স্মরণ ও মাঙ্গলিক শঙ্খ ধ্বনি দ্বারা নত মস্তকে

দেবীর অনুকম্পা প্রার্থনা করিয়া আজও পর্যন্ত হলদী ও বারাতলার মোহানা অতিক্রম করেন এবং প্রত্যাবর্তন কালে বা সময়ান্তরে দেবীর মন্দিরে পূজা প্রদান করিতেন।

দেবীকে কয়েক মাসের জন্য রাণীগঞ্জে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন, পরে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ধ্বংসপ্রাপ্ত অধিষ্ঠিত স্থানের কিছুদূরে নদীর তীর বাঁধের অভ্যন্তরে নূতন গৃহাদি প্রস্তুত কবিয়া শারদীয়া পূজার সময়ে দেবীকে প্রত্যাবৃত্ত করাইয়াছেন।

পীরসলোমন

পীর সোলেমান অদ্ভুত যোগশক্তি সম্পন্ন প্রসিদ্ধ ফকির ছিলেন। ইনি নিজ পত্নীকে পাষাণী করিয়া অনুশোচনায় নিজে যোগমগ্ন হইয়া দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য সেই অত্যাশ্চর্য শক্তি সম্পন্ন ফকিরের স্মৃতি রক্ষার্থে জনসাধারণ তাঁহার বাসভূমি গড়চক্র বেড়িয়াতে এই আস্তানা প্রতিষ্ঠিত কবিয়াছেন। এতদ্দেশের অধিক সংখ্যক মুসলমান উহাকেই কোরাণ বিবৃত সোলেমান সাহেব বলিয়া প্রচার করেন ; কোরাণ বর্ণিত সোলেমান সাহেবের স্মৃতির নিদর্শনে এই আস্তানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গড়চক্রবেড়িয়ার জমিদার বংশধর নিজ গড়বাড়ীর অদূরে সোলেমানের আস্তানা স্থাপনকারী ও সেবাইৎ সাহা বংশধরগণকে ১০৫ বিঘা ভূমি নিষ্কর পীরোত্তর দান করিয়া থাকিবেন। আয়ের দ্বারা পীরের সেবা পূজা ও মহরমের সময় পীরের তাজিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাজখাঁর নিকট অনুগ্রহ প্রাপ্তির জন্য কৃতজ্ঞতার পরিচয়ে গড়চক্রবেড়িয়ার জমিদার চৌধুরী বংশের মুসলিম প্রীতি প্রগাঢ় ছিল এবং প্রীতি পূর্ণ ব্যবহারমুগ্ধমুসলমানগণ ও চৌধুরী বংশের সম্মান রক্ষার জন্য রাজভক্তির পরাকাষ্ঠায় উহাদের জায়গীর প্রদত্ত পীরের তাজিয়ার প্রতি উক্তরূপ শ্রদ্ধাভক্তি অদ্যাপি ও প্রদর্শন করিতে 'বাধ্য রহিয়াছেন।

জানকীনাথের মন্দির*

১৮০৪ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে মহিষাদলের রাণী জানকী দেবী নন্দীগ্রামে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া অষ্টধাতুর নির্মিত রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও মহাবীর বিগ্রহ চারিটি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মূর্তি গুলির গঠন পরিপাট্য নয়নানন্দ দায়ক।

জনশ্রুতি মূর্তিগুলি নির্মাণ করিবার জন্য রাণীর কর্মকার অতি সহজেই রাম, লক্ষ্মণ ও মহাবীর বিগ্রহ তিনটির ঢালাই কার্য সম্পন্ন করেন, কিন্তু জানকীর মূর্তিটি পুনঃ পুনঃ ঢালাই করিয়াও নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এদিকে মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় সন্নিকট হইয়া পড়ায় কর্মকার অতিশয় বিচলিত হইয়া পড়েন। পরিশেষে কর্মকার কার্য বন্ধ করিয়া শেষ চেষ্টার জন্য পূর্বদিন শুদ্ধান্তঃকরণে প্রায়োপবেশনে আত্মোৎসর্গ ব্রত করায় সেই দিবস গভীর রাত্রিতে স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হয় যে, যদি তোমার একমাত্র কন্যাটিকে উৎসর্গ করিতে পার তাহা হইলে তোমার সাধনা সিদ্ধ হইবে। কর্মকার সেই প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হওয়ার পরদিবস জানকী মূর্তির ঢালাই কার্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। তৎপর দিবস কর্মকারের গৃহ হইতে সংবাদ আইসে যে তাহার একমাত্র প্রিয়তমা কন্যাটির অকস্মাৎ রক্তবমনে মৃত্যু ঘটিয়াছে। দুঃসংবাদ প্রাপ্তে কর্মকার স্মিতহাস্যে সংবাদ দাতার নিকট প্রকাশ করে,—মায়ের আশীর্বাদ পূর্ণ হইয়াছে, —'আমার নশ্বর মানবী কন্যার পরিবর্তে আমি অবিনশ্বর দেবীকন্যা লাভ করিয়াছি'। এই বলিয়া কর্মকার অশ্রুসিক্তনয়নে জানকী মূর্তির চরণে প্রণত হইয়া শোক সন্তাপ জুড়াইলেন। মন্দির সহ মূর্তিগুলির প্রতিষ্ঠাকার্য যথাকালে সাড়ম্বরে সম্পাদিত হইবার পর রাণী উক্ত কর্মকারকে নন্দীগ্রামের অদূরে বটতলিয়া মৌজায় কয়েক

---

*কোন এক পাঠ্য পুস্তকে অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় জানকীনাথের মন্দিরকে শিব মন্দির বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

বিঘা ভূমি নিষ্কর প্রদানে ও তথায় বাসগৃহাদি নির্মানে অধিষ্ঠিত ও পুরস্কৃত করাইয়া ছিলেন। উক্ত কর্মকারের পরবর্তী রাণা পদবী বংশধরগণ অদ্যাপি ঐ স্থানে বসবাস করিতেছেন।

মন্দির সহ মূর্তিগুলির প্রতিষ্ঠাকালে মন্দিরের পূর্বপার্শ্বে পঞ্চবটী বন ও পশ্চিমপার্শ্বে জানকী দীঘি নামক জলাশয় খনন করিয়া একই সময়ে রাণী সমস্ত প্রতিষ্ঠাকার্যগুলি সমাধা করিয়া গিয়াছেন। পঞ্চবটীর কেবলমাত্র বট বৃক্ষটি ব্যতীত অপর চারিটি বৃক্ষ নির্মূলিত হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক বৃক্ষের মূলদেশে ইষ্টক নির্মিত বেদী বেষ্টন করিয়া দিয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠাকাল হইতে মন্দিরটি স্থানীয় অধিবাসী পরিচালকের রক্ষণাধীনে আছে। প্রতিদিন দুইবেলা অন্নভোগের ব্যবস্থা ব্যতীত সকালে বাল্যভোগ ও নিয়মিত প্রদত্ত হয়। পূর্বে প্রসাদান্ন নিয়মিত পরিচালক পূজারী—কীর্তনিয়া ও সমাগত অতিথিগণের মধ্যে বিতরিত হইত।

সিংহবাহিনী দেবী ও দধিবামন জীউ

মহিষাদলের রাজা জগন্নাথ গর্গের পত্নী রাণী ইন্দ্রাণী দেবী গুমগড়ের সোনাচুড়া গ্রামে একটি পুষ্করিণী খনন করাইবার কালে মৃত্তিকাগর্ভে স্বর্ণ নিমিত সিংহবাহিনী দেবীমূর্তি প্রাপ্ত হন। ঐ প্রাপ্ত দেবীমূর্তি ও ঐ স্থানের দধিবামন জীউর মূর্তি তিনি ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে মহিষাদলে লইয়া গড় মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। সম্ভবতঃ ঐ দেবীমূর্তি মালজেঠিয়াগড়ের হিন্দু দেশাধিপতিগণের মধ্যে কোন ধর্মশীল দেবীভক্ত রাজাকর্তৃক নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। পরে বর্গীর উপদ্রবের সময় উপদ্রুত অধিবাসীগণ উক্ত স্বর্ণমূর্তি নিরাপদে রক্ষা করিবার জন্য উহা মৃত্তিকা গর্ভে লুক্কায়িত করিয়া মন্দিরে একখানি প্রস্তর খণ্ড স্থাপন করিয়া থাকিতেন। তদবধি ঐ প্রস্তরখণ্ডখানি সিংহবাহিনী আখ্যায় এখন ঐ স্থানের অধিবাসীগণের দ্বারা পূজিতা হইয়া আসিতেছেন।

১২৭২ সালের বন্যার পর সিংহবাহিনী আখ্যাত প্রস্তরখণ্ডখানি অনাদৃত ভাবে ঐ স্থানে পতিত ছিল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে উদ্ধবচন্দ্র মণ্ডল ঐ স্থানে একটি পুষ্করিণী খনন করিয়া ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে নিয়মিত ভাবে দেবীর পূজাদির পুনঃ প্রচলন করেন। পরে উহার পৌত্র বৈকুণ্ঠনাথ মণ্ডলের চেষ্টা যত্নে একটি ইষ্টক নির্মিত মন্দির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। দধিবামনজীউর প্রতিভা নিদর্শন না থাকায় এই স্থানে উক্ত দেবতার কোন অভিনব পূজায়োজন নাই।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে সেটেলমেণ্টে ঐ সকল দেবোত্তর সম্পত্তি পৃথক তৌজিভুক্ত সোনাচুড়া মহাল উল্লেখে লিপিবদ্ধ ছিল। পরে মেদিনীপুর কালেক্টরী এই নিষ্কর দেবোত্তর মহাল ও সাতঙ্গাবাড়ীর পীরোত্তর মহালটিকে বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন।

সাতঙ্গাবাড়ীর আড়িয়া

সাতগাঁ বাড়ীর আড়িয়া নামক দীঘিটি অতি প্রাচীন। উহার জলভাগ অংশটুকু ৯৬০´×৬৪০´ ফুট। এখন উহা সম্পূর্ণরূপে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। উহার ধ্বংসাবশেষ পূর্ব ও দক্ষিণ পাড়ের কোন কোন অংশ বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া গেলেও বর্তমান উহার উচ্চতা ৮।১০ ফুটের অধিক দৃষ্ট হয় না। শতাব্দীকাল পূর্বে চতুঃপার্শ্বের পাড়গুলি ৪০ হইতে ৫০ ফুট পর্যন্ত উচ্চ ছিল জানা যায়।

জনশ্রুতি ষোড়শ শতাব্দীতে সৈয়দ রহমন আলি নামে একব্যক্তি বঙ্গদেশে আসিয়া মেদিনীপুর জেলার সাগর সীমান্তঃবর্তী এই জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে উপনীত হন। তিনিই এই বিখ্যাত মওলানা-পীর নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। এই নির্জন স্থানটি তাঁহার বসবাসের উপযুক্ত বিবেচনায় তিনি উহার উত্তর আড়ার সান্নিধ্যে কতকাংশে ভূমির জঙ্গলাদি পরিষ্কার করতঃ বিভিন্ন স্থান হইতে ছয়টি পরিবার আনাইয়া বসবাস করান। এইরূপ ছয়টি পরিবারসহ

নিজের বাসগৃহ লইয়া সাতটি গৃহ নির্মিত হওয়ায় ইহা সাতগাঁ বাড়ী নামে অভিহিত হইয়াছে।

সম্রাট আকবরের সময় তাঁহার রাজস্ব সচিব তোডরমল্ল কর্তৃক বাংলা সুবাদারী মহালগুলি জরিপ জমাবন্দী দ্বারা স্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার সময় উক্ত সৈয়দ রহমনকে সরকারী কর্মচারী ডাক করিয়া জিজ্ঞাসা করেন 'কি পরিমাণ ভূমি হইলে পীরের সেবাপূজা ও তাঁহার ভরণপোষণ চলিতে পারে? সেই প্রার্থিত ভূমি তাঁহাকে নিষ্কর পীরোত্তর প্রদান করা হইবে।' তাহাতে রহমন সাহেব সহাস্যে উত্তর করেন—'আমার পীর সাহেবের ঐ আস্তানাটুকু চাই, আমি ফকির মানুষ, আমার মৃগচম পাতিবার মত স্থানটুকু প্রয়োজন। সরকার কর্মচারীগণ তাঁহাকে মৃগচর্মের পরিমিত স্থান চিহ্নিত করিয়া লইবার অনুমতি করায় তিনি মৃগচর্ম পাতিতে আরম্ভ করেন। পীরের মহিমায় উহা ১১০০ বিঘা পরিমিত ভূমি অধিকার করায় সরকার কর্মচারীগণ বিস্ময়ে পীরের দরজায় সেলাম দিয়া উক্ত ভূমি নিষ্কর পীরোত্তর দিয়াছিলেন।

তিনি বড়খাঁন সাহেব নামে চিরকাল অভিহিত আছেন। সাতগাঁবাড়ী গ্রামের উত্তর অংশে একটি বিরাট কেয়া জঙ্গল ছিল, ঐ জঙ্গলের মধ্যে বড়খাঁন সাহেবের ব্যাঘ্র থাকিত বলিয়া আজও লোকমুখে শোনা যায়। ঐ পীরোত্তর ভূমিভাগ দেড়শত বৎসরের অধিক কাল পীরের সেবাইত রহমন সাহেবের বংশধরগণের অধিকারে ছিল। পরে সরকার কর্তৃক নীলাম বিক্রয়ে বাজেয়াপ্তি হইয়া গিয়াছে। সাতগাঁ বাড়ীর জনৈক আনন্দচন্দ্র দাস নিঃসন্তান ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করায় তিনি পীরের ইমামবাড়া প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

বারুণী স্নান মেলা

মুর্শিদাবাদের সাধকবাগ আখড়ার মোহান্ত ভরত দাস আউলিয়ার সময় খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে গুমগড় পরগণার কালিচরণপুর

গ্রামে একটি শাখামঠ স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ সময় গঙ্গাসাগর সাগর তীর্থ ক্ষেত্রটি উহাদের অধিকারে ছিল। মোহান্তের শিষ্য গৌরীরাম দাস আউলিয়া পৌষ সংক্রান্তির মাসাধিক কাল পূর্ব হইতে আসিয়া এই মঠে অবস্থান করিয়া গঙ্গাসাগর তীর্থে গমন করিতেন এবং তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া চৈত্রমাস পর্যন্ত এখানে থাকিতেন। তিনিই এই বারুণী স্নান মেলা স্থাপন করিয়া ছিলেন। সাউদখালিব সীমান্তঃবর্তী হুগলীনদী তীরে মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে বারুণী স্নান অদ্যাপি সমারোহেব সহিত চলিয়া আসিতেছে।

স্থানীয় মুসলমান পল্লীর পুবনারীগণও এই স্নান যাত্রার সময় দূরাগত আত্মীয় কুটুম্বগণের সহিত বারুণী মেলার আনন্দ উপভোগ করেন। স্নানঘাটের পূর্বপার্শ্বে নদীগর্ভে নাকচিরা চরের উৎপত্তি হওয়ায় নদী স্রোতকে দূরবর্তী করিয়া স্নানতীর্থের ঘাটটিকে একটি সংকীর্ণ খালের তীরে অবস্থিত করাইয়াছে।

রাণীগঞ্জের যুগ্ম শিব মন্দির

গর্গ বংশের লছমন প্রসাদের সহধর্মিণী রাণী নিস্তারিণী দেবী ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে হলদীনদীর মোহানার দক্ষিণ তীরে গুমগড় পরগণার অরণ্যভূমি পরিষ্কৃত করিয়া একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবসাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেন; পরে তথায় রাজকীয় কাছারী, প্রাসাদ, পুষ্করিণী খনন করিয়া পুষ্করিণী তীরে যুগল শিব মন্দির ও নাট্যশালা* নির্মাণ করিয়া ছিলেন।

---

* নাট্যশালা গাত্রে সংযোজিত প্রস্তর ফলক বা লিপির পাঠোদ্ধার।

"যুগদ্বষ্টাঙ্কমে শাকে মধবাত্র যুগে বা বৌ।
নিস্তারিণী রাজমাতা প্রতিষ্ঠিতা শিবদ্বয়ং॥
*   *
'আঠারশ' বীরদিন শক বিংশতি বৈশাখে।
রাজ্ঞী নিস্তারিণী শিব প্রস্থাপিল সুখে।"

খেজুরী বন্দর নামক পুস্তকে দৃষ্ট হয় কুকুড়াহাটীগামী খেজুরীর ডাকপিয়ন এই পথ অতিক্রম করিত। চৈত্র সংক্রান্তির সময় শিবের গাজন উপলক্ষে বহু যাত্রীর সমাগম হইত। এই সময় হলদী নদীর তীরদেশ সমাচ্ছন্ন করিয়া পণ্য ও যাত্রীবাহী নৌকাগুলি সর্বদা শ্রেণীবদ্ধাকারে বিরাজমান থাকিত। এই নবাধিষ্ঠিত বাণিজ্য কেন্দ্রের স্থানটিকে পুণ্যবতী রাণীর কীর্তিস্মারকোদ্দেশ্যে প্রজাবর্গ রাণীগঞ্জনামে অভিহিত করিয়াছিলেন। হলদীর ভাঙনস্রোতে ইহার সমস্ত স্মৃতিটুকু বিলীন হইয়াছে।

গাংড়ার বন বাশুলী

গুমগড়ের দক্ষিণ পূর্বপ্রান্তে গাংড়া নামক স্থানে যে বাশুলীদেবী আছেন তিনি সাধারণতঃ গাংড়ার বাশুলী বা বনবাশুলী নামে পরিচিত। এই বাশুলীদেবী একখণ্ড প্রস্তররূপে গাংড়ার লবণ উপকেন্দ্রের সন্নিহিত স্থানে অরণ্য মধ্যে পতিত ছিলেন। প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বে উক্ত গাংড়া গ্রামবাসী ভগীরথ প্রধান কর্তৃক উক্ত দেবী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ঐ ব্যক্তি প্রতিদিন কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য অরণ্য মধ্যে গিয়া পতিত ঐ প্রস্তর খণ্ডের উপর আপনার কুঠার ও কাটারী ধারাল করিবার উদ্দেশ্য ঘর্ষণ করিত। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইবার পর এক দিন রাত্রিতে দেবী স্বপ্নযোগে দর্শন দান করিয়া প্রকাশ করেন যে অদ্য তোমার কাটারীর ঘর্ষণে আমার শরীরে আঘাত লাগিয়া আমার অত্যন্ত যন্ত্রণা হইয়াছে। তুমি অদ্য হইতে আর আমার শরীরের উপর তোমার অস্ত্র ঘর্ষণ করিও না। অধিকন্তু তুমি আমাকে তোমার গৃহে আনাইয়া প্রতিদিন আমার স্থান মার্জনা ও ধূপদীপ প্রদানের ব্যবস্থা করিও। আমি এই বনের অধিশ্বরী বাশুলী দেবী।

পরদিন প্রভাতে উক্ত ব্যক্তি সেই প্রস্তরময়ী দেবীকে জঙ্গল হইতে আনাইয়া আপন বাসভূমি সন্নিহিত স্থানে স্থাপন করতঃ দেবীর

নির্দেশ মত স্থান মার্জন ও সন্ধ্যাদি প্রদানের ব্যবস্থা করেন। তাহাতে অল্পদিন মধ্যে উহার অবস্থার উন্নতি সূচিত হইতে থাকায় উক্ত সংবাদ চতুর্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। স্থানীয় তহশীলদার কর্তৃক মহিষাদলের তদানীন্তন ভুস্বামী দেবীব আবির্ভাব সংবাদ প্রাপ্তে—দেবীকে রাজপুরীতে লইয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার মানসে জমাদার ও বরকন্দাজ প্রেরণ করেন। কিন্তু উক্ত ব্যক্তি অর্থের প্রলোভনে ও রাজাকে দেবীর প্রস্তর মূর্তি প্রদান করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় উহাকে বন্দী করিয়া রাজ সমীপে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে বন্দীশালা মধ্যে স্বপ্নযোগে রাত্রিকালে দেবী উহাকে দর্শন দান করিয়া অভয় প্রদান করেন এবং রাজহস্তে দেবীকে সমর্পণ কবিবার নিষেধ আজ্ঞা করেন। পরদিন প্রাতঃকালে রাজা উহাকে দববার সভাতে ডাকাইয়া দেবীর প্রস্তর মূর্তি প্রদান করিবার জন্য নানাভাবে প্রলোভিত ও পরিশেষে কঠোর দণ্ডের ভীতি প্রদর্শন করেন। কিন্তু যখন কিছুতেই সে দেবীকে প্রদান করিতে স্বীকৃত হইল না, তখন রাজা সক্রোধে উহার হস্তের উপর উত্তপ্ত লৌহখণ্ড স্থাপনে শাস্তির ব্যবস্থা করিলেন। রাজ আজ্ঞা প্রতিপালিত হইল। উত্তপ্ত লোহ খণ্ড উহার হস্তের উপর প্রদত্ত হইল—কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র কষ্টের অনুভূতি প্রকাশ পাইল না, সে আনন্দে উচ্চৈস্বরে মাতৃনাম স্মরণ করিতে লাগিল। সভাসদ-গণসহ রাজা বিস্ময়াভিভূত হইয়া মুক্তি প্রদান করিলেন এবং দেবীর সেবাপূজার জন্য জনৈক নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণের ব্যবস্থা ও ব্যয়াদি নির্বাহের জন্য ২২/০ বিঘা ভূসম্পত্তি দেবোত্তর প্রদান করিয়াছিলেন।

কিন্তু উহা গ্রামবাসীগণের অমনোযোগিতায় সংস্কারাভাবে ধ্বংসের সম্ভাবনায় পৌঁছিয়াছে।

আমদাবাদ গ্রাম ও চালমারীপুকুর

কেওড়ামাল পরগণার আমদাবাদ গ্রামের একটি শ্মশান ক্ষেত্রের পার্শ্বে এই 'চালমারী' নামক পুকুরটি অবস্থিত। পুকুরটি পরিমাণে

বৃহত্তর না হইলেও উহার আলৌকিক বৈশিষ্ট্যের জন্য উহা উল্লেখ-যোগ্য। পুকুরটি কোন সময়ে ও কাহার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল জানা যায় নাই। এই পুকুর সম্পর্কে নানা কিংবদন্তী রহিয়াছে। ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে যে ব্যক্তির যে পরিমাণ রন্ধন ভোজন ও পান পাত্রাদির প্রয়োজন হইত, সেইমত একটি তালিকা লিপিবদ্ধ করিয়া পূর্ব দিবস সন্ধ্যাকালে উক্ত পুকুরপাড়ের এক অংশের পরিষ্কৃত স্থানে তালিকাখানি রক্ষা করিয়া জলদেবতাকে প্রণামপূর্বক মানস করিয়া আসিলে, তালিকাভুক্ত দ্রব্যগুলি পর দিবস প্রাতঃকলে সেই পরিষ্কৃত স্থানে সজ্জিত অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যাইত। কর্মান্তে কর্ম-কর্তা প্রাপ্তদ্রব্যগুলি উত্তমরূপে পরিমার্জিত ও ধৌত করিয়া সেই স্থানে প্রদান করিয়া আসিতেন। কিংবদন্তী কোন দুরাশয় ব্যক্তি ঐরূপ প্রাপ্তদ্রব্যগুলি আত্মসাৎ করায়, সেই সময় হইতে উক্তকীর্তিব অবসান ঘটিয়াছে। পুকুরটি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর সংস্কৃত হইয়াছিল কিনা সেরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কয়েক বৎসর মাত্র পূর্বে পঙ্কোদ্ধার করিবার সময় উহার তলদেশের দক্ষিণ পশ্চিম পার্শ্বে কোণাকোণি ভাবে একটি ৩ ফুট চওড়া ইষ্টক নির্মিত প্রাচীর কিংবা গৃহ দেওয়ালের ভগ্নাবশেষ বাহির হইয়াছিল।

ইংরাজী ১৯৪৪ ঐ গ্রামের সালে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ভৌমিক ও তাঁহার পুত্র শ্রীঅমূল্যরতন ভৌমিক এই শশ্মানের নিকট একটি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের চেষ্টায় ঐখানে বাজার, পোষ্টাফিস ইত্যাদি বসে ও বাৎসরিক মেলা বসিয়া থাকে।

আমদাবাদ গ্রামে আরও কয়েকটি দেবীর আস্তানা রহিয়াছে। তন্মধ্যে মধ্য আমদাবাদে মঙ্গেশ্বরী দেবীর স্থান উল্লেখযোগ্য। প্রবাদ জাহাজের মাস্তুলের উপর ঐ দেবী মূর্তির আসন। পূর্বে যখন ইহা সমুদ্র ছিল সেই সময় একদা এক জাহাজ ডুবিয়া যায়। ইহা ছাড়া উৎকল ব্রাহ্মণ জানকীনাথ পাণ্ডা মহাশয়ের বাড়ীতে কালু রায়ের কয়েকটি প্রস্তর শীলা রহিয়াছে। ক্ষুদ্র শিলাগুলিকে কালুরায়

দেবীর সন্তান বলিয়া কল্পনা করা হয়। তা ছাড়া উক্ত গ্রামে বাড়ীমাল পাড়ায় ওলাবিবির আস্তানা পরিলক্ষিত হয়। ঐ গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় প্রসিদ্ধ সানকিদের শীতলা মন্দির আছে। প্রতি বৎসর ঐখানে তিনবার মেলা হয়। এ ছাড়া দক্ষিণ আমদাবাদে দোল পূর্ণিমায় গৌরাঙ্গের অষ্টপ্রহর নামযজ্ঞ ও মহোৎসব হয়।

জয়চণ্ডী

নন্দীগ্রাম থানার বহুস্থানে চণ্ডীদেবীর মন্দির দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে শিমুলকুণ্ড মৌজার জয়চণ্ডী খুবই প্রসিদ্ধ। প্রবাদ আছে একটি স্রোতবাহী সুগভীর খালের প্রান্তদেশে একটি সুমিষ্ট জলপূর্ণ কুণ্ড ও উহার তীরদেশে এক বিশালকায় শিমুল বৃক্ষের অবস্থান হইতে স্থানটির নাম শিমুলকুণ্ড হইয়াছে। কুণ্ডের পার্শ্বদেশে এক বিরাট শ্মশানক্ষেত্র বিদ্যমান ছিল।

বহুদিন হইতে ঐ শিমুল বৃক্ষের তলদেশে একখণ্ড প্রস্তর পতিত ছিল। ইহাই কালক্রমে দেবীর আসনে অধিষ্ঠিতা হইয়াছেন। দেবীর বর্তমান সেবাইতগণের পূর্বাধিকারী কোন ব্যক্তি স্বপ্নযোগে উক্ত প্রস্তর খণ্ডে দেবীর আবির্ভাব জ্ঞানে সেবাপূজা দ্বারা ঐ স্থানে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন। জনশ্রুতি শিমুলবৃক্ষের অদূরে কণ্টকাকীর্ণ অরণ্য মধ্যে দেবীর বাহন এক বিশালকায় ব্যাঘ্র বহু সময় লতাগুল্ম আবদ্ধ অবস্থায় দৃষ্ট হইত, অথচ উহার দ্বারা কোন দিন মনুষ্য-গবাদির কোন অনিষ্ট সাধিত হয় নাই।

বর্তমান দেবীর আনুষ্ঠানিক পূজার দিন চারিদিক হইতে ভক্ত-পরায়ণ ব্যক্তিগণ ঢাকবাদ্যসহ সমাগত হইয়া পূজা প্রদান করিয়া থাকেন। শিমুলকুণ্ড গ্রাম নিবাসী গোবর্দ্ধন সামন্ত ১৩৩৯ সালে দেবীর বর্তমান ইষ্টক মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

সিন্দুরটিকা মঠ

বাংলা ১২৮০ সালে নরসিংহপুরের ৩নং বাড় সিন্দুরটিকা গ্রামের মঠটি বাবাজী ইন্দ্রনারায়ণ দাস অধিকারী কর্তৃক আসদতলিয়ার

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত দে মহাশয়ের সৌজন্যে শিরিপুর হইতে পরিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে।

ইন্দ্রনারায়ণ দাস অধিকারীর উর্ধতন পুরুষগণ জাতিতে মাহিষ্য ছিলেন। পরে তাঁহারা বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত ও মধ্যাচার্য সম্প্রদায়ে মিলিত হইলেও মাহিষ্যগণের সঙ্গেই বৈবাহিকত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

ইন্দ্রনারায়ণ দাস অধিকারী মধ্যযৌবনে পুত্র পত্নী পরিজন ও গৃহ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণে দেশ ভ্রমণ ও তীর্থ পর্যটন করিয়া বাবাজী আখ্যা লাভ করেন। পরিশেষে, রানীগঞ্জের নিকটবর্তী শিরিপুর নামক স্থানে আশ্রম স্থাপন করিয়া মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সেবাপূজা গীতা ভাগবত শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। বহু জ্ঞানী ও গুণগ্রাহী ব্যক্তি তাঁহার নিকট সমাগত হইতেন। তৎকালে এতদঞ্চলের মুখ্য ব্যবসায় কেন্দ্র রানীগঞ্জ বাজারের আয়কর আদায়ের জন্য লক্ষ্মীকান্ত দে মহাশয় মহিষাদল রাজষ্টেট হইতে ইজারাদার অর্থাৎ হাট দারোগা নিযুক্ত ছিলেন ; সেই সূত্রে তিনি শিরিপুর আশ্রমে যাতায়াত করিতে করিতে বাবাজী ইন্দ্রনারায়ণ দাস অধিকারীব বিশেষ পরিচিত হইয়াছিলেন। দে মহাশয় তাঁহার গভীর জ্ঞান ও ভগবদ্ভক্তি দৃষ্টে আসদতলিয়ার সন্নিকটে নরসিংহপুরের ৩নং বাড় সিন্দুরটিকা স্থানে মঠ প্রতিষ্ঠার জন্য ৪/০ বিঘা ভূমি ও বাবাজীর ভরণপোষণের জন্য ৩/০ বিঘা জলজমি দানপত্র সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। তৎপর আরও কতিপয় ধর্মানুরাগী ব্যক্তিগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান দ্বারা মঠের সম্পত্তির পরিমাণ ১৮/।১৯/০ বিঘায় পরিণত হইয়াছে। মঠের মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ, গোপাল ও জগন্নাথ দেবের বিগ্রহমূর্তিও রঘুনাথজীউ, নৃসিংহজীউ, সুদর্শনচক্র, গিরিধারী, গোমতীচক্র প্রভৃতি শালগ্রাম শিলাগুলি বিরাজমান। * ঝুলন, জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী অন্নকূট, রাস ও দোলযাত্রা প্রভৃতি উৎসবে বিশেষ পূজার প্রচলন দৃষ্ট হয়। শিবচতুর্দশী তিথিতে সারারাত্রি নাম সংকীর্তন ও অন্ন

মহোৎসব দ্বারা বৈষ্ণব সেবা কার্য নিষ্পন্ন হয়। এতদ্ব্যতীত প্রতি দিবস মধ্যাহ্নে অন্নভোগ ও রাত্রিতে ফলমূল ও চিড়ামুড়কী প্রভৃতি দ্বারা দেবতার ভোগ নিবেদিত হয়।

বাবাজী ইন্দ্রনারায়ণ দাস অধিকারী মন্দিরে সান্ধ্য আরতি করিবার সময় প্রজ্বলিত পঞ্চপ্রদীপ হস্তে ধ্যানস্থ অবস্থায় দেহত্যাগ করেন।

কালিচরণপুর ও কালুরায় ঠাকুর

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে গুমগড় পরগণার পূর্বপ্রান্তে হুগলী নদীতীরে এই কালিচরণপুর গ্রামখানি নিবিড় অরণ্যগর্ভে অবস্থিত ছিল। বর্তমান হুগলী নদী দূরে সরিয়া যাওয়ায় উহার পার্শ্বে সাউদখালি জলপাই ও সাউদখালি চর নামক মৌজা দুইটির উদ্ভব হইয়াছে। গুমগড়ে চৌধুরী জমীদারী প্রতিষ্ঠিত হইবার পর চৌধুরী বংশের সম্ভবত দ্বিতীয় পুরুষ নন্দী গোপাল চৌধুরী নদী প্রান্তের অরণ্যময় ভূমিভাগগুলির জঙ্গলাদি পরিষ্কার করতঃ কৃষিভূমিতে পরিণত ও গ্রাম স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎকালে এই স্থানের অরণ্য মধ্যে কালুরায় নামক এক শক্তি সাধক বাস করিতেন। জনশ্রুতি তাঁহার আশ্রমের চারি পার্শ্বে হিংস্র ব্যাঘ্রকুল বিচরণ করায় কোন ব্যক্তি সেখানে গমনে সাহসী হইতেন না। আবশ্যক কালীন সেই সাধক লোকালয়ে আগমন করিতেন। সেই অবকাশে একদিন সাধকের সহিত চৌধুরী দেশপালের সাক্ষাৎ ঘটায় তিনি তাঁহার নিকট ঐ অরণ্য ভূমি পরিষ্কার করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাহাতে সাধক কালুরায় দেবীর নিকট রাজার প্রার্থনা নিবেদন করিয়া আদেশ প্রাপ্তে রাজাকে জঙ্গল পরিষ্কারের নির্দেশ দিয়াছিলেন। সেই হইতে উক্ত স্থান কালিমাতার অনুকম্পায় মুক্তি প্রাপ্তির জন্য কালিচরণপুর নামে অভিহিত রহিয়াছে।

সাধক কালুরায় জীবদ্দশাকাল পর্যন্ত সেই আশ্রমে উপাসনার [illegible]

দেহরক্ষা করিলে—জনসাধারণ প্রান্তিক নদীতীর জঙ্গলে তাঁহার সমাধি স্থানের উপর প্রস্তর খণ্ড দ্বারা স্মৃতি বেদী নির্মাণ করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে সেই ভগ্ন স্মৃতি বেদীর প্রস্তরখণ্ডগুলিকে কয়েক স্থানে স্থাপন রাখিয়া তাহাকে কালুরায় ঠাকুর আখ্যায় স্থানীয় অধিবাসিগণ—পূজা করিয়া আসিতেছেন। এইভাবে কালুরায় ঠাকুরের আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

বর্ত্তমান কালিচরণ পুরের এক অংশ সাউদখালি নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। ঐ সাউদখালির উত্তর পল্লীর পশ্চিমাংশে রাম পড়্যার মাজনা নামক পুকুরের পাড়ে প্রতি বৎসর চৈত্রমাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে সাড়ম্বরে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উক্ত স্থানেই সাধক কালুরায়ের আশ্রম ছিল কিনা তাহা অজ্ঞতার অন্ধকারে নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

বিক্ষিপ্ত নিদর্শন সমূহ

প্রচীন মঠ-মন্দির মসজিদ ব্যতীত নন্দীগ্রামের বহুস্থানে ভূগর্ভের অভ্যন্তরে আরও নানা বিগ্রহ ও বা পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীগৌরী গ্রামের এক পুষ্করিণী খনন কালে প্রায় তিনফুট উচ্চ ও একফুট প্রশস্ত এক চতুর্ভুজ বিষ্ণুর শিলামূর্তি আবিষ্কৃত হয়। স্থানীয় লোকজন উহাকে বৃক্ষতলায় রাখিয়া মধ্যে মধ্যে পূজা করেন। ইহা ছাড়া নন্দীগ্রামে বৃক্ষতলে ভগ্ন বিষ্ণুমূর্তি পড়িয়া রহিয়াছে। আমদাবাদ গ্রামে শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মাইতি মহাশয় পুষ্করিণী খনন করিবার সময় প্রায় ১০ ফুট নীচ হইতে একটি শ্লেট পাথরে খোদিত ৮" ইঞ্চি বিষ্ণু মূর্তি ও দুই একটি মাটির ভাড় প্রাপ্ত হইয়াছেন। খুব সম্ভব সমুদ্রগামী কোন ব্যক্তির অরণ্যযান হইতে তাহা ঐ স্থলে পতিত হইয়াছিল।

———

৩

মেলা ও পূজাপার্বণ

নববর্ষারম্ভের মেলা

সাধারণত এই মেলাটি খয়ান মেলা নামে অভিহিত। বামুন আড়া গ্রামের বর্ধমান শীতলা ও শাপুর গ্রামের শীতলা দেবীর স্থানে মেলা দুইটি বসে। দুই তিন দিন উহা স্থায়ী হয়। আমদাবাদ গ্রামে সানকীদের শীতলা মন্দিরে চৈত্র সংক্রান্তির মেলা বসে।

অক্ষয় তৃতীয়ার মেলা

এই মেলাটি ও বামুন আড়া বর্ধমান শীতলার মন্দির প্রাঙ্গনে তিন দিন স্থায়ী ভাবে বসে। বিপুল জন সমাগম হয়। দেশী চামারের নির্মিত চটি জুতা সুলভ মূল্যে প্রচুর বিক্রীত হয়। দেশীয় ফলের মধ্যে সুপক্ক বিল্ব বেশ সস্তাদরে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। এই সময় বাশুলিচকে বাশুলী মন্দিরেও এক দিনের জন্য একটি স্নানযাত্রার মেলা বসে। পশ্চিম আমদাবাদে একটি এই উপলক্ষে মেলা বসে।

রথযাত্রার মেলা

নন্দপুর, গোকুলনগরের তেখালি বাজার ও আমদাবাদ এই গ্রাম তিনটিতে রথযাত্রা ও উল্টোরথের দিন একদিন করিয়া মেলা বসে। চাষের কাজের সময়ে ও পল্লী অঞ্চলের এই সকল মেলায় জন সমাগম মন্দ হয় না। সম্প্রতি সাঁইবাড়ী ও রংকিনীপুর গ্রামের কতিপয় যুবক মাঘ মাসে রথমেলা আরম্ভ করিয়াছে।

পৌষ সংক্রান্তির মেলা

বাশুলীচকের বাশুলীদেবীর সন্নিকট হলদী নদীতে স্নান উপলক্ষে ও গোকুলনগরের কাঁসাদহের খালের পাড়ে একদিনের জন্য একটি

মেলা বসে। সংক্রান্তির পর দিবসে নন্দীগ্রামের জানকীনাথের মন্দির সন্নিকটে এবং দুর্গাপুরের নাড়াভাঙা মাঠে একটি করিয়া মেলা বসে। নাড়াভাঙা মেলাটি ৩ দিন স্থায়ী থাকে। আমদাবাদের পশ্চিম প্রান্তে সানকীদের শীতলা মন্দির প্রাঙ্গনে একটি মেলা বসে। মৃত্তিকা নির্মিত হাঁড়ী-কলসী, জালা ও গামলা প্রভৃতি আমদানি ও বিক্রয়ের জন্য বিশেষ বিখ্যাত।

শিবচতুর্দশীর মেলা

শিবচতুর্দশীর মেলার মধ্যে রায়াপাড়া গ্রামের শ্রীশ্রী৺সিদ্ধনাথ শিবের মেলাটি বিশেষ বিখ্যাত। উহা ১ সপ্তাহ কাল স্থায়ী থাকে। এখানে সার্কাস—ম্যাজিক—চলন্তিকা ছবি কথা প্রভৃতির আমদানি হয়। বহু প্রকারের দোকান পসরার ও সমাগম হয়। শিমুলকুণ্ড গ্রামের ৺বিশ্বনাথজীউ শিবের মেলাটি এক রাত্রির জন্য সাধারণ ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ব্যক্তিগত ভাবে মহম্মদপুর গ্রামে স্বর্গীয় রামনারায়ণ পড়ুয়া মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শিবের মেলাটিও উল্লেখ-যোগ্য। প্রমোদ উৎসবের জন্য বহু জন সমাগম হয়। কলিকাতা, হাওড়া,.২৪ পরগণা ও মেদিনীপুরের সমৃদ্ধ অপেরা যাত্রাপার্টিগুলির অভিনয় প্রায় সপ্তাহ কাল চলিয়া থাকে।

দোলযাত্রা

দোলযাত্রা উপলক্ষে আমদাবাদ গ্রামে মেলা বসিয়া থাকে। নন্দীগ্রামে দোল যাত্রার উৎসব কয়েকদিন পঞ্চমী তিথিতে হইয়া থাকে।

বারুণী স্নান মেলা

চৈত্র মাসের মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী উপলক্ষে অধুনা ৭নং জালপাই গ্রামে গড়ের খালের মোহনায় ১ দিনের জন্য এই স্থানে মেলাটি বসিয়া থাকে।

গান্ধী মেলা

মহাত্মা গান্ধীর তিরোভাব বৎসর হইতে এই মেলাটি গোকুলনগর গ্রামে গোবিন্দ জীউ শিক্ষা নিকেতনের নিকট স্থানে কৃষ্ণপদ বেরা মহাশয়ের পরিচালনায় স্থাপিত হইয়াছে। মহাত্মার চিতাভস্ম সংগ্রহে শহীদ মঞ্চ নির্মাণ করিয়া তাঁহার স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর চরকা প্রতিযোগিতা, সূত্র যজ্ঞ, রামধুন গীত, গীতা-বেদ পাঠ ও হরিনাম সংকীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং খাদি বস্ত্রাদির প্রদর্শন মেলা বসে।

গম্ভীরা বা গাজন মেলা

চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে রায়াপাড়া ও আমগেছিয়া গ্রামে সংক্রান্তির পূর্বদিন বিকালে বঁটিঝাঁপ ও রাত্রিতে নীলপূজা ও পরের দিন বিকালে চড়ক মেলা বসিয়া থাকে। কয়েকদিন পূর্ব হইতে গাজনের ভক্তা অর্থাৎ ভক্ত সন্ন্যাসীগণের নৃত্য কৌতুক ও তরজা অভিনয় এবং সাজসজ্জা মনোরম ও হাস্য উদ্দীপক। চড়কের মেলায় ঘুড়ির লড়াই ও ঘোড়ার দৌড় প্রতিযোগিতা দেখিবার জন্য বহু দর্শকের সমাগম হয়।

শারদীয়া দুর্গোৎসব

অধিকাংশ গ্রাম্য দেবীর মন্দিরে ও ব্যক্তিগত ভাবে ধনী ব্যক্তি-গণের গৃহে শারদীয়া দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হইলে ও বিশেষ ভাবে সর্বজনীন পূজাগুলির মধ্যে বাগুলী চক, হাঁসচড়া, খোদামবাড়ী, কালিচরণপুর, নন্দীগ্রাম এবং পুরুষোত্তমপুর ও শিমুলকুণ্ড রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের পূজা উৎসবগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই স্থান কয়টিতে বহু দর্শনার্থীর সমাগম হয়। যেমন, হাঁসচড়া ও খোদামবাড়ীতে আতসবাজীর আড়ম্বর থাকে—তেমনি কালিচরণপুরে পাঁচালী যাত্রাভিনয় দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাসন্তী দুর্গোৎসব একমাত্র আকন্দবাড়ী গ্রামেই চিরাচরিত ভাবে চলিয়া থাকে অন্যান্য স্থানে ব্যক্তিগত ভাবে উহা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

শ্যামাপূজা ও কালী পূজা

রায়াপাড়া গ্রামে দীপান্বিতা কালীপূজা বিশেষ সমারোহে নিষ্পন্ন হয়। অতীতে মায়ের নিকট মহিষ বলি উপহৃত হইত। অধুনা বলি প্রথা বন্ধ হওয়ায় দর্শক সমাগমে সেরূপ উদ্দীপনা দৃষ্ট হয় না।

মধুকৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে মহেশপুর ও কালিচরণপুর (প্রকাশ সাউদখালি) গ্রামে মহা সমারোহে কালীপূজা হয়। মহেশপুরে দেবীর নিকট অন্নভোগ ও মিছরি ভোগ দেওয়া হয়।

গঙ্গাপূজা

প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে সোনাচূড়ার তালপাটি ও সাউদখালি জালপাইর কাটাখালি ও তেরপেখিয়া খেয়াঘাট গুলিতে সাড়ম্বরে গঙ্গাপূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং সেই উপলক্ষে ৩।৪ রাত্রি নাট্যাভিনয় দর্শন জন্য বড়লোকের সমাগম হয়। তেরপাখিয়াতে প্রতি তৃতীয় বৎসরে ঐ সময় একটি বারোয়ারী মেলা বসে। মেলাটি ও নাট্যাদির অভিনয় প্রধান আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য।

সাধারণ বার ব্রত পূজাদি

প্রায় প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতে সাধারণত ভাবে মহিলাদের দ্বারা স্থাপন সংক্রান্তি (জ্যৈষ্ঠমাসের সংক্রান্তি) দশহারা ও নাগপঞ্চমীতে মনসাপূজা, কোজাগরী পূর্ণিমা ও অগ্রহায়ণ পৌষ মাসের প্রতি বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীপূজা ও শ্রাবণী পূর্ণিমা এবং দীপান্বিতার সময় গো পূজার প্রচলন দেখা যায়। অনেক ব্রাহ্মণ পুরোহিতের দ্বারা ও ঐ সকল পূজা সমাধা করেন। অনেকের বাড়ীতে স্থায়ী ভাবে শীতলা চণ্ডীমণ্ডপ থাকে ও সম্প্রতি নানা প্রদর্শনীর মেলা প্রসার লাভ করিতেছে।

৪

গোষ্ঠী ও সমাজ আন্দোলন

প্রায় পোণে দুই লক্ষ লোকের বাসভূমি এই নন্দীগ্রাম থানার বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে মাহিষ্যরা সংখ্যা গরিষ্ঠ সম্প্রদায়। মাহিষ্য ব্যতীত যে সব বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায় রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ প্রধান। তাহাদের পদবী সাধারণতঃ পাণ্ডা, সন্‌বিগ্ন, মিশ্র, চক্রবর্তী, মহাপাত্র, তিয়ারী, ত্রিপাটি প্রভৃতি। কৌলিক বৃত্তির মধ্যে পূজা, সংস্কৃত চর্চা ইত্যাদি প্রধান। বর্ণ হিন্দুদের যাবতীয় পূজা, ও আচার অনুষ্ঠানে ইঁহারা পৌরহিত্য করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট পাচক ব্রাহ্মণ ও রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ ব্যতীত গ্রহবিপ্র বা আচার্য ব্রাহ্মণ, অগ্রদানী ব্রাহ্মণ রহিয়াছে। অনেক ব্রাহ্মণ তফ্‌শীল ভুক্ত নিম্ন জাতির পৌরহিত্য স্বীকার করায় স্ব সমাজে প্রতিষ্ঠা হারাইয়াছেন। করণ সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজদিগকে কায়স্থ বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন। খুব সম্ভব তাঁহারা উড়িষ্যা হইতে আগত বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী। ইহারা হলাকর্ষণ করেন না। মাহিষ্য সম্প্রদায়ের লোকজনদের পদবী অত্যন্ত অদ্ভূত। দীণ্ডা, জানা, মান্না, মাইতি, কলা, ভৌমিক, মাঝি, মূলা, বেরা, ঘোড়ই, ঘটক, সামন্ত, সাঁতরা, দাস, পাত্র, প্রামাণিক, গিরি, প্রধান, সাহু, ওঝা, ডগরা, পাল, মাটিয়া, করণ, ভুঁইয়া, গায়েন প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য।

কৌলিক বৃত্তি কৃষিকার্য এবং সম্পন্ন পরিবারের অনেকে বিদ্যাচর্চা ও অনুরূপ উপজীবিকায় আগ্রহশীল।

গোয়ালা, ধোপা, নাপিত, কামার, কুমোর, পৌণ্ড্র, নমশূদ্র, কদমা প্রভৃতির কিছু কিছু পরিবার বিভিন্ন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে পৌণ্ড্র সম্প্রদায়েরা সংখ্যার বেশী। বর্তমানে তাহাদের মধ্যে বিদ্যালাভের আগ্রহ দেখা যাইতেছে। বিভিন্ন

গোষ্ঠী বা জাতিগুলির বিশেষ সামাজিক মর্যাদা বা অধিকার দীর্ঘদিন হইতে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ আসিয়া পড়িলে অনেক দেশকর্মী ও সমাজকর্মীর মনে এই ধরণের জাতিভেদ প্রথার কুফলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে। যাহার ফলে বিভিন্ন বর্ণ বা জাতির সহিত মিলন হইবার নানা ফলবতী প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে বা বিভিন্ন সময়ে যে সব ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ অত্র দিতে চেষ্টা করিব। তাহার পূর্বে আমাদের এই অঞ্চলের যে কয়টি অত্যন্ত অপরিচিত সম্প্রদায় রহিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

চিত্রকর, পটিদ'র বা পটুয়া

নন্দীগ্রাম থানার আমদাবাদ গ্রামের কুমিরমারা পল্লীতে, নান্‌কাচক প্রভৃতি স্থানে তাহাদের সংখ্যা বেশী। তাহারা অর্ধেক হিন্দু, অর্ধেক মুসলমান বলিয়া পরিচিত। তাহারা হিন্দুদের পূজার্চনার মূর্তি গড়িয়া কখনও বা পট দেখাইয়া, গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া থাকে। তাহাদের বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা ভিক্ষা করে। ভিক্ষা করিবার সময় মৃত্তিকা নির্মিত খেলনার পুতুল বিক্রয় করা হইল একটি প্রধান কাজ। প্রতিমা নির্মাণ করে বলিয়া হিন্দুর দেব মন্দিরে তাহাদের অবাধ গতি রহিয়াছে। পুরাণ বর্ণিত বিশ্বকর্মার এক সন্তান বলিয়া তাহারা দাবী করিয়া থাকে। কিন্তু সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে অর্থাৎ, বিবাহ শ্রাদ্ধ শান্তিতে মুসলমান সম্প্রদায়ের মুন্সী বা কাজী আসিয়া নামাজ করায়। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার পরে যখন হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষ প্রবল আকার ধারণ করিল তখন ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধি যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। আমদাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান শিক্ষক শ্রীঅমূল্যরতন ভৌমিক তখন ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের ডাকাইয়া প্রান্তিক গোষ্ঠীর লোক-

গণকে হিন্দু মতে চলিতে রাজি কিনা জিজ্ঞাসা করায় পরেশ চিত্রকর ও নগেন চিত্রকর স্ব সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব লইয়া শুদ্ধি যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করিতে উৎসুক হন। ইহার ফলে আমদাবাদ উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে বিরাট শুদ্ধি যজ্ঞ, হোম ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসী শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ এই যজ্ঞের হোতা ছিলেন। চিত্রকর রমণীদের শাড়ী, শাঁখা প্রদান করা হয়। কেয়াখালি গ্রাম নিবাসী শ্রীকাঙাল চন্দ্র পণ্ডাও স্বেচ্ছায় তাহাদের পৌরহিত্য করিতে স্বীকৃত হওয়ায় তিনি সমাজের সকলের নিকট বিশেষ অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে নগেন ও পরেশ চিত্রকর মৃত্যু মুখে পতিত হইলে চিত্রকরগণ দিশাহারা হইয়া পড়ে। বিভিন্ন সমাজের কিছু কিছু ব্যক্তি তাহাদের সাহায্য করিলেও তাহারা নিতান্ত অসহায় মনে করে। ঐ সময় মুসলমান কাজী ও মুন্সীরা আসিয়া তাহাদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা পায়। ফলে অনেকে মুসলমান হইয়া পড়ে। এই বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর প্রবোধকুমার ভৌমিক মনোজ্ঞ গবেষণা করিাছেন। (২৭)

শবর বা সাপুড়ে

নন্দীগ্রাম থানার নানা স্থানে শবর বা সাপুড়ে শ্রেণীর এক সংখ্যা লঘিষ্ঠ সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা নলা (teleoscopic spear) চালাইয়া পক্ষী শিকার করে এবং বড়শীর বাঁশ বিক্রয় করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। স্ত্রীলোকেরা ভিক্ষা করিয়া থাকে কখনও বা খেজুর পাতার মাদুর বা পাটি তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করে। ইহারা নিজদিগকে পুরাণ বর্ণিত জারা শবরের বংশধর বলিয়া দাবী করে। উক্ত জারা শবর শ্রীকৃষ্ণকে পক্ষী ভ্রমে

---

(২৭) Some Social Movements in Midnapur— 1960), Dr. P. K. Bhowmick.

বিষাক্ত নলা দিয়া বিদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহারা গ্রামের কিনারে পর্ণ কুটির নির্মাণ করিয়া বাস করে। গৃহাদি অত্যন্ত অপরিসর ও ক্ষুদ্র। কোন ক্রমে মাথা ঢুকাইয়া থাকা যায় মাত্র।

জীবিকার জন্য সর্প ধরা তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের এক প্রধান কার্য। সর্প ধরিবার জন্য অত্যন্ত সাহসের প্রয়োজন হয়। দুই খণ্ড ক্ষুদ্র বাঁশের ছড়ি দিয়া কেঁউটে (অত্রস্থানে তঁপ সাপ) বা গোখুরে সর্প-গুলির উপর আঘাত করিলে তাহারা ছোবল দিবার জন্য ফণা ধরিয়া গর্জন করিতে থাকে। তখন একজন পশ্চাদ দিক হইতে গিয়া লেজ ধরিয়া টান দিয়া উপরে উত্তোলিত করিয়া সজোরে ঘুরাইতে থাকে। তাহাতে এই ভয়াল জীব মেরুদণ্ডের গ্রন্থীর বন্ধন হারাইয়া নিস্তেজ হইয়া পড়ে। তখন তাহাকে ধরিয়া তাহার বিষ দাঁত উত্তোলন করে। তাহার পর ঐ জীব ভয় প্রাপ্ত হইয়া নির্জীবের মত পড়িয়া থাকে এবং আঘাত দিলে গর্জন করিতে থাকে। এই ভাবে সাপ লইয়া খেলা করা ইহাদের এক বৈশিষ্ট্য। সাপ খেলাইবার সময় তাহারা বাইকুণ্ডলী বাজাইয়া নানা রকম গান গাহিতে থাকে। সেই সকল গান শুনিতে বেশ ভাল। ইহারা সবর্ণে বিবাহ করিয়া থাকে। এক বিবাহ, সাঙ্গা বা বিধবাবিবাহ ইহাদের সমাজে প্রচলিত। বিবাহের সময় পাত্র পক্ষকে কন্যাপণ দিতে হয়। কখনও কখনও ইহাদের গৃহ-জামাতা রাখিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

নিজেদের সমাজগত আলোচনা করিবার জন্য তাহাদের যে পঞ্চায়েত আছে তাহাকে 'দেশ' বা সমাজ বলিয়া থাকে। তাহাতে নিজদিগের সমস্যার আলোচনা করে। মৃতের সমাধি দেওয়া তাহাদের আর একটি সামাজিক প্রথা। দশদিন অশৌচ থাকে। ঐ সময় মৃতের আত্মার উদ্দেশ্যে 'তরাস' দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে মনসা পূজার প্রচলন আছে। সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে তাহারা অংশ গ্রহণ করিতেছে। এই সব

উপজীবিকাহীন সম্প্রদায়গুলির (২৮) মধ্যে যেমন কুসংস্কারের অন্ত নাই তেমনি শিক্ষারও অভাব রহিয়াছে।

কাকমারা বা কাওয়ামারা

কাকমারা বা কাওয়ামারারা নন্দীগ্রাম থানার আর এক যাযাবর সম্প্রদায়। এই যাযাবর গোষ্ঠী নন্দীগ্রামের নানাস্থানে বৎসরের কিছু কিছু সময় অস্থায়ীভাবে বসবাস করিয়া থাকে। এই গোষ্ঠীগুলি কাক মারিয়া খায় বলিয়া ইহারা কাকমারা নামে পরিচিত। ইহারা তেলেগু ভাষায় বাংলা মিশাইয়া কথা বলে। ইহাদের জীবন যাত্রায় নানা বৈচিত্র্য রহিয়াছে। স্থায়ী কোন বাসস্থান নাই বলিয়া ১০।১৫ দিন অন্তর একটি আস্তানা পরিত্যাগ করিয়া থাকে। হাট বাজারের চালা ঘরই ইহাদের তখন বাসস্থান হইয়া দাঁড়ায়। নন্দীগ্রাম থানার সিদ্ধরের বাজারে ইহাদের সাময়িক আস্তানা আছে। সেখানে বৃদ্ধ, অক্ষম ব্যক্তিরা বাস করে। পুরুষ বা স্ত্রী ভিক্ষা করে। ভিক্ষা করিবার সময় তাহারা মাথায় একরকমের টুপি পরে। ঐ টুপির কারুকার্য খুব সুন্দর। আর ডান হাতে একটি লোহার বালা থাকে। একটি বাঁটহীন লোহার ছুরি অবিরত নাড়িয়া এক প্রকার ঠুংঠুং শব্দ করা ইহাদের বৈশিষ্ট্য। ভিক্ষায় যাইবার সময় বাড়ীর ব্যবহৃত হাঁড়ি বা বিছানাপত্র শ্মশান ভূমির কোন উচ্চ গাছে বাঁধিয়া রাখে। শ্মশানে পরিত্যক্ত হাঁড়ি বা মৃন্ময় ভাণ্ড অথবা বিছানাপত্র অবলীলা ক্রমে ব্যবহার করে। ইহাদের আর এক উপজীবিকা হইল কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি খোজাকরা। ইহারা খুব নেশা করে ও অনর্গল পান চিবাইতে থাকে।

কাকমারাদের জীবনযাত্রা অত্যন্ত অদ্ভুত। ইহারা ভাগিনেয়ীকে বিবাহ করে। ইহাদের সমাজে দুইটি দল বা সামাজিক স্তর (২৯) রহিয়াছে। এক দলের পুরষ অন্য দলের স্ত্রীর সহিত বিবাহ বন্ধন স্থাপিত করে। ইহাদের পদবী হইল দাস বা সর্দার।

(২৮) Savaras of Midnapur, (1955), Prof. P. K. Bhowmick.
(২৯) ডক্টর প্রবোধ কুমার ভৌমিক (১৯৬১)—সমাজ ও সম্প্রদায়

বিবাহের জন্য পণ দেওয়া আর এক রীতি। কখনও কখনও নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ যোগ্য যুবক যুবতীর বদল করা হয়। জন্ম হইতে বিবাহ, মৃত্যু পর্যন্ত সময়ে তাহাদের জীবনে অনুষ্ঠানের কোন অভাব নাই। বালিকা সোমত্ত হইবার সময় কতকগুলি অনুষ্ঠান আচরণ করিতে হয়। তাহা অনেকাংশে দক্ষিণ ভারতের অনেক উপজাতির রীতিনীতির মত। (৩০) বিবাহের রীতিনীতি ও অদ্ভুত।

মৃতের সমাধি দেওয়া তাহাদের আর এক রীতি। স্ব সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি এই সকল কার্যে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। অশৌচ পালনের পর সাতটি আঘাত দিয়া একটি শূকর হত্যা করা হয়। পরে তাহাকে পোড়ান হয়। মৃতের আত্মার প্রীতির জন্য একটি কুকুরও হত্যা করা হয়। নিজদিগের সমস্যা, নারী ঘটিত বিবাদ বিসম্বাদ নিবারণের জন্য তাহাদের একটি সমাজগত পঞ্চায়েত আছে।

উল্লিখিত তিনটি অদ্ভুত গোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় প্রাচীন সমাজ জীবনের পরিস্কার প্রভাব রহিয়াছে। ইহা ছাড়া কৃষ্ণনগর গ্রামের দীঘি পাড়ে একদল মুসলমান ধর্মাবলম্বী শবর রহিয়াছে। তাহাদিগকে কলম দান শবর বা পানিয়া ভাঙ্গা শবর বলা হয়। ইহারা গরুর শিং হইতে পানিয়া বা চিরুনী তৈয়ারি করে। স্ত্রীলোকেরা ভিক্ষা করে। পুরুষদের ছাতা সারান, বড়শী তৈয়ারি, গোসাপ ধরা উল্লেখ-যোগ্য উপজীবিকা।

এই ভাবে আমাদের পাশাপাশি যতগুলি নিরুপদ্রব প্রতিবেশী রহিয়াছে তাহাদের জীবন যাত্রার আরও গভীর অনুসন্ধান প্রয়োজন। এই সকল সম্প্রদায়গুলি প্রত্যক্ষ ভাবে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক জীবন ধারার সংগে মিলিয়া মিশিয়া রহিয়াছে।

---

(৩০) The Kakmara—a nomadic community in West Bengal (1959), Dr. P. K. Bhowmick

নন্দীগ্রাম থানায় বিভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায়গুলির মধ্যে যে পরিবর্তনের তরঙ্গ আসিয়াছে তাহাও লক্ষ্য করিবার মত। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দেশে যখন অস্পৃশ্যতা বর্জন আন্দোলন বা হরিজন আন্দোলন সুরু হয় তখন নন্দীগ্রামে অনুরূপ অনেক অনুষ্ঠান হয়। ইতিপূর্বে হরেকৃষ্ণ মণ্ডল মহাশয়ের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইঁহার অকাতর অর্থ ব্যয়ে এই আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠে ও সমাজে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন দৃঢ় হইতে থাকে।

আর একটি উল্লেখযোগ্য সমাজ আন্দোলন হয় আমদাবাদ গ্রামে। আমদাবাদ গ্রামের স্বর্গীয় হরেকৃষ্ণ দাস পৌণ্ড্র সমাজের একজন নিষ্ঠাবান সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। নিজ অধ্যবসায় ও শ্রমে তিনি প্রভূত অর্থের অধিকারী হন। যখন অস্পৃশ্যতা বর্জনের প্রবলতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তখন ঐ গ্রামের শ্রীযোগেন্দ্র নাথ ভৌমিক ও সুবদী গ্রাম নিবাসী শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র জানা নেতৃত্ব লইয়া হরেকৃষ্ণ বাবুকে একটি বিরাট প্রীতি ভোজ করিবার উৎসাহ দেন। তাহাতে একদল লোক বিশেষ বাধার সৃষ্টি করে। প্রতিবেশী অভয় কামিলা (স্বর্ণকার), আনন্দদীণ্ডা, ভিখারী আচার্য্য প্রভৃতি বাধাদান করিয়াছিল বলিয়া একটি ছড়া ঐ সময় তৈয়ারী হইয়াছিল।

'আনন্দ এঁড়ে (ষাঁড়), অভয় গাই,
জীবন বাছুর, ভিখারী ধাই।'

যাহাই হউক এই বিরাট জন সভায় স্বর্গীয় অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ বল মহাশয় পৌরহিত্য করেন। প্রায় ১৫ হাজার লোকের জনতা এই প্রীতিভোজে অংশ গ্রহণ করে। দীন দরিদ্র, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য নির্বিশেষে এই রূপ ভোজনের উদাহরণ আর নাই বলিলে চলে। ইহার পর হইতে সমাজগত ভাবে অনেক বাধার নিরসন হইল। ইহাতে সর্ব শ্রেণীর পাচক ছিল। ইহার বেশ কিছুদিন পরে হরেকৃষ্ণ বাবুর পুত্রগণ তাহাদের পিতৃশ্রাদ্ধে এই রকমের একটি প্রীতি-

ভোজের আয়োজন করিলে কয়েকজন প্রতিবেশী বাধার সৃষ্টি করে। কিন্তু স্থানীয় যুবকদের চেষ্টায় তাহা আর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই। এইরূপ নানা ভাবে সমাজ আন্দোলন (৩১) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই রকমের সমাজ আন্দোলন কৃষ্ণনগরের প্রভাসআদিত্য গিরি মহাশয় স্বীয় গ্রামে হাড়িদের মধ্যে গড়িয়া তুলেন। প্রভাস আদিত্য গিরি ১৯৪২ সালের রাজনৈতিক আন্দোলনে এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যু দেশ ও সমাজের এক প্রবল ক্ষতি করিয়াছে।

বর্তমানে এই সমাজ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিক ভাবে কতকগুলি সামাজিক রীতিনীতিও উল্লেখযোগ্য। ধরমকুটুম, সইপাতান, ধরমবাবা ইত্যাদির দ্বারা অনেক অস্পৃশ্য জাতির সহিত উচ্চবর্ণের লোকজনের এক অদ্ভুত মৈত্রী বন্ধন দেখা যায়। এই সকল মৈত্রী বন্ধনের জন্য বিশেষ বিশেষ মেলা বা পূজায় বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোক সমবেত হইয়া মিতালী পাতায়, হরিরলুঠ দেয়। আবার আপদবিপদেও এই সকল সম্পর্কের কুটুম্বরা (৩২) অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। মোট কথা বর্তমানে সর্ব শ্রেণীর লোকের মধ্যে এক মৈত্রী ও প্রীতির বন্ধন উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। ইহা ছাড়া নানা প্রকার রাজনৈতিক আন্দোলন, নেতৃবর্গের উদার মনোভাব দেশবাসীর মনের মধ্যে এক উদ্দীপনার সৃষ্টি করিতেছে। উহার ফলে দেশে এক নব জাগরণের উন্মেষ ঘটিতেছে।

---

(৩১) Some Sosial Movements in Midnapur. (1960) Dr. P. K. Bhowmick

(৩২) Some Artificial Relationships. (1961) Dr. 'P. K. Bhowmick

৫

শিক্ষা-সাহিত্য ও বর্তমান প্রসঙ্গে

নন্দীগ্রাম থানায় বর্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণাঙ্গ মহাবিদ্যালয় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত এই অঞ্চলে শিক্ষার বিশেষ প্রসার ছিল না। বিত্তবান ব্যক্তিদের বাড়ীতে পাঠশালা বসিত। ঐ সকল বিদ্যালয়ে উড়িয়া, বাংলা ইত্যাদি শিক্ষাদান করা হইত। শিক্ষক মহাশয়েরা 'সরকার' বলিয়া অভিহিত হইতেন। ধীরে ধীরে বিভিন্ন স্থানের কতক প্রভাবশালী সমাজ কর্মী ও ত্যাগী জমিদারগণের চেষ্টায় আজ দ্রুত শিক্ষা বিস্তার ঘটিয়াছে। সম্প্রতি এই থানার বহু 'হায়ার সেকেণ্ডারী' বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয় রহিয়াছে। তাহার মধ্যে কয়েকটি বালিকাদের জন্য রহিয়াছে।' স্বাধীনতা লাভের পূর্বে নন্দীগ্রাম, আশদতলিয়া ও হাঁসচড়া এই তিনটি উচ্চ বিদ্যালয় ছিল। নন্দীগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়টির পশ্চাতে তদানীন্তন সাবরেজিস্ট্রার সতীশ বাবু ও প্রধান অর্থদাতা কালিচরণপুর গ্রামের ফকির চাঁদ দাস ছিলেন। ইহার পরে স্থানীয় চেষ্টায় এই বিদ্যালয়ের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। হাঁসচড়া বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ধনঞ্জয় গায়েন। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পূর্বে এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে জনসাধারণের প্রচেষ্টায় বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান স্থানীয় এম, এল, এ শ্রীপ্রবীর চন্দ্র জানা মহাশয় বহু বিদ্যালয়ের সহিত জড়িত থাকায় ও তাঁহার চেষ্টায় বহু বিদ্যালয় সরকারী সাহায্য ও বিভাগীয় অনুমোদন' লাভে সমর্থ হইয়াছে।

দীর্ঘদিন হইতে এই অঞ্চলের কতিপয় শিক্ষিত যুবকের মনে মহা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ছিল। তাঁহাদের মধ্যে আমদাবাদ

গ্রামের শ্রীঅমূল্যরতন ভৌমিক ও টাকাপুরা গ্রাম নিবাসী শ্রীচিত্তরঞ্জন দাসের নাম উল্লেখযোগ্য। এইখানে ইহা উল্লেখ যে অমূল্য বাবু আমদাবাদ উচ্চ বিদ্যালয় ও টাকাপুরা উচ্চ বিদ্যালয় দুইটির প্রতিষ্ঠাতা। গ্রামাঞ্চলে একই গ্রামে দুইটি উচ্চ বিদ্যালয় অন্যত্র কোথাও নাই। তাঁহারা এই বিষয়ে শ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদ কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ, শ্রীপ্রশান্তকুমার বসু ও তদানীন্তন গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ বর্তমান কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের কলেজ সমূহের পরিদর্শক শ্রীঅমিতেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট যথেষ্ট সহানুভূতি, প্রেরণা ও উপদেশ পাইয়াছিলেন। টাকাপুরাতে কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য স্থানীয় শ্রীবেনীমাধব পাল মহাশয় অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহা পালন করেন নাই। যাহাই হউক তাঁহাদের সে চেষ্টা ঐসময় ব্যর্থ হইলে ও পরে তাহা বাস্তবে রূপায়িত হয়। ধান্যখোলার শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র মাইতি যখন এককালীন পঞ্চাশ হাজার টাকা দানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন তখন স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি ও স্থানীয় সাবরেজিষ্ট্রার মহাশয় হইতে উৎসাহিত বোধ করেন। শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র মাইতি মহাশয় স্বনামধন্য ব্যরিষ্টার সারদাচন্দ্র মাইতির পরিবারের লোক। ক্ষীরোদবাবু অপুত্রক। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হওয়ার পর তিনি তাঁহার জমিদারীর আয় হইতে প্রথম ৫০ হাজার টাকা দান করেন। ঐ কলেজ প্রতিষ্ঠায় যে কয়েকজন ব্যক্তি নেতৃত্ব করেন তাহাদের মধ্যে ডাঃ ভোলানাথ চন্দ্র, ডক্টর প্রবোধকুমার ভৌমিক, তদানীন্তন এম, এল, এ শ্রীভূপাল চন্দ্র পাণ্ডা, ৺পূর্ণ চন্দ্র রাউত, শ্রীরামপদ সৎপতি, শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ মজুমদার, প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্য শিক্ষক মহাশয়গণ ও প্রয়োজন মত সহযোগিতা করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে ডক্টর ভৌমিক প্রভৃতি ব্যক্তিগণ পুনরায় শ্রীপ্রশান্তকুমার বসু ও শ্রীঅমিতেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণের পরামর্শ মত

অগ্রসর হইতে থাকেন। এইখানে ইহা উল্লেখ যে উক্ত দুই অধ্যক্ষ মহাশয়ের কৃপায় মেদিনীপুর জেলার বহু দরিদ্র ছাত্র শিক্ষালাভে সমর্থ হইয়াছে। অর্থ সংগ্রহের সময় শ্রীবেনীমাধব পাল মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আগাইয়া আসেন। তখন তদানীন্তন মহকুমা শাসক এই দুইজন দাতার স্বর্গীয় পিতৃদেবের নামানুসারে সীতানাথ (বেনীবাবুর পিতা) ও আনন্দ মোহন (ক্ষীরোদ বাবুর পিতা) নামকে সীতানন্দ কলেজ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহাই স্বীকৃত হয়।

কলেজ অনুমোদন করিবার প্রাক্কালে তদানীন্তন কলেজ সংহের পরিদর্শক ডঃ এ, পি, দাশগুপ্ত, ব্যারিস্টার শ্রীনন্দকিশোর ঘোষ, অধ্যাপক শ্রীদুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় ও উপাধ্যক্ষ শ্রীসুখেন্দ্রকুমার রায় ও শ্রীচুনীলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই সুদূর পল্লীগ্রামে গমন করিয়াছিলেন। ঐ সময় শ্রদ্ধেয় দাশগুপ্ত ও ঘোষ মহাশয় জনসাধারণের এই উৎসাহকে অভিনন্দিত করেন ও বিজ্ঞান বিভাগের অনুমোদন পাইতে হইলে আরও অর্থের প্রয়োজন বলিলে সভাস্থলে প্রায় ১০।১২ হাজার টাকা দানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। যাহার ফলে বিজ্ঞান বিভাগ অনুমোদন পাইবার সুবিধা হয়। এই কয়েকজন মহান ব্যক্তির নাম শুধু নন্দীগ্রাম বাসী নহে সমগ্র জেলা-বাসী চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করিবে। যদিও কয়েকজন ব্যক্তি এই সময় কলেজীয় শিক্ষা ব্যবস্থার বিরোধিতা করিয়াছিলেন তবুও এই মহা বিদ্যালয়ের উন্নতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। নানা বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও ডাঃ ভোলানাথ চন্দ্র, ডক্টর প্রবোধ কুমার, ভৌমিক, শ্রীভূপাল চন্দ্র পাণ্ডা কী ভাবে যে কঠোর শ্রম করিয়াছেন, নিজদিগের বহু অর্থ ও সময় দিয়া মহা বিদ্যালয়ের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করিয়াছেন তাহা লেখনী দিয়া প্রকাশ করা সম্ভব নহে। সম্প্রতি মাননীয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী মহোদয়গণ ও স্থানীয় এম, এল, এ মহাশয়গণ এই মহা বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনে সতর্ক

দৃষ্টি রাখিয়াছেন ও যুবক অধ্যাপক মণ্ডলী সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছেন।

নন্দীগ্রাম থানার কয়েকজন স্থানীয় লেখক বা সাহিত্য অনুরাগী ব্যক্তির কথা আলোচনা করিলে হরিবোলানন্দ স্বামীর (মৃঃ ১৩৩২ সাল) কথা ধরিতে হয়। ইহার আদি নাম যুধিষ্ঠিব নারায়ণ দাস অধিকারী, ও স্বগ্রাম হইল বৃন্দাবন চক। প্রথম জীবনে ইনি শিক্ষকতা করিতেন পরে ইহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। ইনি যে কয়টি ভক্তি মূলক নাট্য কাব্য রচনা করিয়াছিলেন সেগুলির মধ্যে 'জীবউদ্ধার', 'নাস্তিক দর্শন' ও 'জগাই মাধাই' অন্যতম। পরবর্তী কালে ইহার লেখা লঘু ভারতের প্রথম পর্ব প্রকাশিত হয়।

সামসাবাদ গ্রামের নীলমণি দাস (মৃঃ বাং ১৩৪০ সাল) একজন কবি ছিলেন। তিনি মুখে মুখে উপমা দিয়া ছড়া তৈরী করিতে সিদ্ধ হস্ত ছিলেন।

রাজারামপুরের সাগরদাস কবিরত্ন (মৃঃ বাং ১৩৩৮) মহাশয় প্রসিদ্ধ ব্যাকরণ টীকাকার ছিলেন। তিনি ঐ অঞ্চলে আর্য সমাজ আন্দোলনের পথ প্রদর্শক ছিলেন। তিনি 'স্বগত চিন্তা' নামে একটি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন।

নন্দীগ্রাম থানার কালিচরণপুর গ্রামের আর একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ছিলেন অযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ। পরে তিনি ইতিহাসের অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। তিনি হাওড়া জেলার কোন এক উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন। ঐতিহাসিক তথ্য অনুসন্ধানের জন্য তিনি 'দিব্য-স্মৃতি-সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার বহু লেখা প্রবাসী, বসুমতী, ভারতবর্ষ, প্রবর্তক প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

জামবাড়ী গ্রাম নিবাসী পণ্ডিত ভূতনাথ কাব্যতীর্থের (বাং ১২৯৮-১৩৪৭) কেবল সাহিত্যানুরাগ নহে তাহার সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। তিনি জল-অচল অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের

নিমিত্ত 'বর্ণ ও ব্যবসায়' ও 'আর্যকেষক' নামক দুইখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন।

ঘোলপুকুর গ্রামের শ্রীভাগবত চন্দ্র মণ্ডল ও দীর্ঘদিন সাহিত্যের সেবা করিয়াছেন। তাঁহার লেখা কাব্যগ্রন্থ 'পত্রবিতান' উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া এই থানায় আরও অনেক লেখক নানা ভাবে সাহিত্যের সেবা করিতেছেন। নন্দীগ্রামে শ্রীরবীন্দ্র নাথ পাণ্ডা, শ্রীপরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী (পাঞ্চজন্য পত্রিকার সম্পাদক) শ্রীঅমূল্য রতন ভৌমিকের নাম উল্লেখযোগ্য। অমূল্য বাবুর বহু লেখা মেদিনীবাণী, মাহিত্য সমাজ ও যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীললিতকেশ ত্রিপাটি মহাশয় স্থানীয় ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীগোরাচাঁদ গিরি ও শ্রীঈশান চন্দ্র মহাপাত্র মহাশয়গণের মেদিনীপুর জেলার রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসের পটভূমির উপর লেখাগুলি বিশেষ প্রনিধানযোগ্য। অধ্যাপক সুহৃদকুমার ভৌমিকের 'উত্তর কাহিনী' উপন্যাস সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইনি এই অঞ্চলের তরুণ সাহিত্যিকদের মধ্যে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। বহু পত্রিকায় তাহার লেখা নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। সম্প্রতি সাঁওতালী ভাষায় তাঁহার এক পত্রিকা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক ও সমাজতত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া ও বাংলার সমাজ সংস্কৃতির পটভূমিকায় গবেষণার জন্য কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর প্রবোধ কুমার ভৌমিকের নাম উল্লেখযোগ্য। 'সমাজ ও সম্প্রদায়' 'প্রাগ্ ঐতিহাসিক সংস্কৃতি', উপজাতির কথা (ডঃ মীনেন্দ্র নাথ বসুর সহিত), প্রভৃতি পুস্তক ব্যতীত 'মেদিনীপুর কাহিনী, 'মেদিনীপুরের কথা ও কাহিনী', 'মেদিনীপুরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি' প্রভৃতি বহু পুস্তক তাঁহার রচিত। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার বহু মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বেশীর ভাগ প্রবন্ধগুলি এই জেলার সমাজ সংস্কৃতি ও উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া। তাঁহার

'The Lodhas of West Bengal—a Socioeconomic Study' পুস্তকটি একটি গবেষণার প্রামাণ্য পুস্তক হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছে। সংস্কৃতি পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তিনি বহু পুস্তক সম্পাদনা করিয়াছেন।

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যে সকল মণীষী এই অঞ্চলের গৌরব স্থান অধিকার করিয়া ছিলেন তাহার মধ্যে বিরুলিয়া গ্রাম নিবাসী আশুতোষ জানা (বাং ১২৮৭-১৩৪৩) র নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি কৃষি, শিল্প, চিকিৎসা ইত্যাদিতে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে নানা সম্মানে ভূষিত করেন। সমাজ হিতৈষণা কার্যে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, 'মাহিষ্য তত্ব বারিধি' ও 'আচার্য ব্রাহ্মণ' নামে দুইটি পুস্তক প্রনয়ণ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি শ্রীতাপস চন্দ্র প্রধান রসায়ন শাস্ত্রে গবেষণা করিয়া ডক্টর অফ্ ফিলজফি উপাধি লাভ করিয়াছেন। ব্যায়াম সম্পর্কে বিরুলিয়া গ্রামের শ্রীবিধুভূষণ জানা একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করিযাছেন।

ইহা ছাড়া বহু বিত্তবান বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি দেশ ও সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য বিশেষ ভাবে সমাজ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। তাজপুর গ্রামের নরহরি জানা (বাং ১২২-১৩০৯), কালিচরণপুরের ফকির চন্দ্র দাস (বাং ১২৪৮-১৩২৭), বৃন্দাবনচক গ্রামের হরেকৃষ্ণ মণ্ডল (বাং ১২৯৩-১৩৫৪), মহম্মদপুরের রামনারায়ণ পড়ুয়া (বাং ১২৭৫-১৩৫৯), মুরাদপুর গ্রামের হরনারায়ণ দাস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। নরহরি বাবু মাহিষ্য জাতির আন্দোলনে পুরোধা ছিলেন। ফকির বাবু বহু প্রতিষ্ঠানে অর্থও ভূসম্পত্তি দান করিয়াছেন, হরেকৃষ্ণ বাবু অস্পৃশ্যতা আন্দোলনে, আর্তসেবায় এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন ভিষগ্ তীর্থ অরুণ চন্দ্র ঘটক (বাং ১৩০০-১৩৫৮ সাল)।

এতদব্যতীত এই থানায় বহু শিল্পী নৃত্যনীত ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। আমদাবাদে 'গোবিন্দ অপেরা' ও 'বালক সংগীত', রাণীচকের 'প্রসন্ন অপেরা' স্থানীয় বহু ব্যক্তিকে এই সুযোগ দিয়াছে। কালিচরণপুরের থিয়েটার বিশেষ ভাবে শ্রীগগনচন্দ্র মাঝি, শিমুলকুণ্ডের শ্রীঅরবিন্দ গিরি, ৺লোকনাথ মিশ্র, বিষ্ণুপদ রানা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। আমদাবাদের ৺গোপাল চন্দ্র শেঠ, সাতগাঁবাড়ীর কৃত্তিবাস চাউল্যা, ঘোলপুকুরের কৃত্তিবাস মাইতি, খোদামবাড়ীর ৺নীলকণ্ঠ মাইতির নাম উল্লেখযোগ্য। ঐ সময় মুকুন্দ দাসের অনুকরণে কয়েকটি স্বদেশী যাত্রা খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। নন্দীগ্রামে একটি সংগীত চক্র রহিয়াছে।

বর্তমানের নানা প্রসঙ্গ আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যুগোপযোগী বহু আন্দোলন এই অঞ্চলে বিশেষ ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলি উপাস্থিত হইলে নন্দীগ্রাম কংগ্রেস কমিটিতে তাহাই পরিলক্ষিত হয়। ফলে 'কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি', 'কম্যুনিষ্ট পার্টি, 'হিন্দুমহাসভা', 'জনসংঘ' প্রভৃতি রাজনৈতিক দল প্রসার লাভ করে। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নন্দীগ্রামে আসিয়া জনগণকে জনসংঘের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া ছিলেন। প্রথম নির্বাচনে বহু দল থাকায় কংগ্রেস আসনটি পায়, দ্বিতীয় নির্বাচনে কংগ্রেস ঐ আসনটি হারায় ও কম্যুনিষ্ট পার্টি তাহা দখল করে। পুনরায় তৃতীয় নির্বাচনে কংগ্রেস সেই আসনটি উদ্ধার করে। প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টির বহু সমর্থক গান্ধীর আদেশে গঠন মুলক কাজ ও গ্রাম নির্মাণে ব্রতী হয়। ফলে এই অঞ্চলে 'ভূদান আন্দোলন' এর প্রসার ঘটে। গান্ধী স্মারক নিধির কর্মীদের মধ্যে শ্রীপরেশ চন্দ্র জানা, শ্রীনিরঞ্জন খাটুয়া শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মাইতি, শ্রীরেখারাণী জানা, শ্রীপুলিন বিহারী গিরি, শ্রীশশাঙ্কশেখর মান্না ও শ্রীবিদ্যুৎপ্রভা বেরা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ভাষাভিত্তিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে নন্দীগ্রামে একটি রাজনৈতিক সম্মেলন হয়

তাহাতে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ভাষণ দেন। ইহা ছাড়া 'নিরিখ বৃদ্ধি আন্দোলন', সরকারী কর্মচারীদের অন্যায়ের প্রতিবাদে শ্রীযোগেন্দ্র নাথ ভৌমিক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। ইনি বহু সমাজ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। পশ্চিমবংগ জুনিয়র বিদ্যালয়গুলির মধ্যে সংস্থা স্থাপনের যে চেষ্টা হয় নন্দীগ্রামে তাহার সূচনা হয়। ডক্টর প্রবোধকুমার ভৌমিক, শ্রীরাখাল চন্দ্র সংপতি, শ্রীদেবব্রত মাইতি, মহাশয়গণের নেতৃত্বে এই আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করে। নন্দীগ্রাম থানায় সম্প্রতি বহু পাঠচক্র, ক্লাব, পাঠাগার গড়িয়া উঠিতেছে। ইহা ছাড়া এই অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নতির জন্য বহু ব্যক্তি সচেতন হইয়াছেন। যাহার ফলে সমবায় আন্দোলন, খাদিও কুটির শিল্পের প্রসার ঘটিতেছে। সম্প্রতি এই থানায় তিনটি ব্লক অফিস স্থাপিত হইয়াছে।

———

পরিশিষ্ট

চৌধুরীচরিত

(নন্দীগ্রাম থানার তাজপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মণ্ডল মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত প্রাচীন তালপত্রের উৎকল অক্ষরে লিখিত পুঁথি হইতে বাংলা অক্ষরে পরিবর্তিত (১৯২৬ খৃষ্টাব্দে সংকলিত)।

বন্দি শ্রীগুরুকৃষ্ণ চরণ--
লেখনি কলে মু ধারণ।
কণ্ঠরে উগার বাণী—
করুণাময়ী বীণাপাণি।
অধম মুই অজ্ঞজন
যেমন্তে ধরে চাঁদে বামন।
নাহি যে কিছি বিদ্যাবুদ্ধি
কেমন্তে লিখি বই পুথি।
তো দয়া নহিলে দেবি
মনে মিলিব বাঞ্ছা সবি।
তু বরদা করুণা কর—
ভাষরে রসনা পুর।
এ লেখা চৌধুরী চরিত
হব সুজন মনপুত।
বাঞ্ছা পূরণ বাঞ্ছাময়ী—
শ্রীপাদপদ্মরে রাখ থুই।
পনরশ' পঞ্চাশ শক'রে
নিন্দিত হই ভগ্নীঠারে।
ক্ষোভরে আঁখি ধারে তিতই
গৃহ পরিজন ছাড়ই।
কাহারে কিছি ন বলই
হিজলী মণ্ডলে মিলই।
সেথারে বৈসে দয়াবান
খ্যাত নবাব তাজ খাঁন।
হেরই তাঙ্ক দরবারে
সভাসদ মণ্ডল ঘিরে।
দেব সভারে ইন্দ্র যেন
চৌভিতে বেড়ি দেবগণ।
পাত্র মিত্র আউ সামন্ত
রাজ্যের যেতে বলবন্ত।
কেহ কারে ন পুছই
নীরবে কর্ম যে সাধই।
চৌধুরী পৌছি হেনকালে
বসন দেই নিজ গলে।
কর যে ছুঁয়াই কপালে
সেলাম দিলে জনাবালে।
তা পর যুড়ি দুই পাণি
মুখরে প্রকাশয় বাণী।
বিনয় সহ শিষ্টাচার
হেরি নবাব তোষ ভর।

পুছই সুযতনে তায
দিয়ো তুম্ভর পরিচয়।
নিশানা আদি নামধাম
কহ অজ্ঞাতজনা উত্তম।
চৌধুরী পুন নম্র শিরে
নাম প্রচারে যোড় করে।
ব্রজগোপাল অজ্ঞজন
চৌধুরী পদবী আখ্যান।
হই গুমাই রাজ মাতুল
নির্ধন দীন সমতুল।
যাচিন কর্ম ভগ্নী পাশে
গঞ্জনা পাই কটুভাষে।
তহি কারণে ফিরি দেশে
ঠাঁই ন মিলে ভাগ্য দোষে।
শুনি আপন দয়াচিত
দেশ মধ্যরে বিখ্যাত।
দয়া কর তু দণ্ডপাণি—
দেহ নকরি একখেনি।
শুনি নবাব কহে তাঙ্ক
নকরি করিবু কেতে তঙ্ক ?
চৌধুরী কহে দয়াবান
কি হেব দীনর অর্থমান।
আশীলে নবাব তথি
তু রহ মোর রক্ষী সাথী।
এমন্তে লভই চাকরী—
হিজলীরে বৈসিলে চৌধুরী।
নবাব ভ্রাতা সিকন্দর
চৌধুরী হৈলে তা দোসর।
ক্রমে হইলা সৈন্যচারী
রণপটু সে অস্ত্রধারী।
এমন্তে গলে দুঃখ লেশ
কাটে সুখরে পঞ্চ বরষ।
নবাব তাঙ্ক হস্তে দিলে
তুলি আপন করবালে।
রণে বাঁধি সে রাজদলে
আনই সবে ছত্র তলে।
ময়ূর ভঞ্জ—বালেশ্বর
সুবর্ণরেখা মধ্যর।
পটাশপুর পিঙ্গলা
মুল্লুক যুড়ি রাজ্যকলা।
শেষরে রাজা গোবর্দ্ধনে
বাঁধিলে হিজলী জিনে।
সন্ধিরে সে বন্দী হইল
কিঞ্চিৎ দান পাইল।
পরগণা গুটে সুজামুঠা
দান যে আউ সব মুঠা।
উপাধি লই রণঝম্প
রৈলে নবাব অন্তরঙ্গ।
এমন্তে রাজা গোবর্দ্ধন
হিজলী ছাড়ি হেলা ভিন।
রহি স্বাধীন স্বতন্ত্ররে
নয়া যে সুজামুঠা গড়ে।
রহে নবাব অনুগতে
চৌধুরী সহ সৈন্যপতে।
হিজলী মণ্ডল মাঝে
সেদিন হইতে রাজে।
নবাব তোষ খোসমনে
প্রীতে বাঁধই গোবর্দ্ধনে।

চৌধুরী প্রাণে অগ্রক্ষোভ
নবাবে দেলা ব্যগ্র লোভ।
মৈযাদল রাজ্য বিজযে
আনে নবাবে উত্তেজিযে।
রাজা কল্যাণ তথাকার
হেরই শত্রু ভযঙ্কব।
সাথে মাতুল বিভীষণ
নিস্ফল জানি বৈব রণ।
যুদ্ধ ন করি নরপতি
সন্ধি যাচিলে হস্ত পাতি।
কর প্রাপ্তিরে করতলে
নবাব অভয দানিলে।
ছিনি তস্বরে এক দেশ
গুমগড় বলি যা প্রকাশ।
ইনাম দিলে চৌধুবীরে
সনন্দ লিখই ফাসিবে।
ছাপ লাগাই হস্ত পাঞ্জা
ব্রজগোপালে লেখি বাজ্ঞা।
স্থাপই তাকু সেই ধারে
নবাব গলে তোষ ভরে।
ভাঙ্গি ছাউনি ফৌজ যত
কলে হিজলী প্রত্যাগত।
কতক তার চৌধুরীরে
অর্পণ কলে হর্ষ ভরে।
গঙ্গাতটরে চক্রবেড়ে
অতল স্রোত ধারা ঘিরে।
উত্তম স্থান লক্ষ্য করি
তথিরে গড়ি গড়বাড়ী।
চৌশালা পুরী সৈন্যাবাস
মন্দির আদি সুদৃশ্য।
চৌধুরে কবি দণ্ডধব
নবাব ত্যজে গুমগড়।
আপন রাজ্যে গলে ফিবি
আনন্দ মনে ধীরি ধীবি।
বার্ত্তা দিলে যে পাত্রগণে
চৌধুরী যশঃ পুনে পুনে।
পাত্র উত্তম ভীমসেন
বলে প্রভুঙ্ক দযা মন।
বাজ্য দানিলে অনুগতে
কীর্ত্তি ভবিলা মেদিনীতে।
চৌধুরী থিলে বন্ধুজন
উত্তম দান এ আপন।
মোর চিত্তরে অভিলাষ
কীর্ত্তি থুইতে তার পাশ।
নবাব বোলই হউ হউ
বাঞ্ছা পূরণ করি যাউ।
বোলই পাত্র দযাময
চাহি দানিতে জলাশয।
চৌধুরী রাজ্যরে খুদি
কিঞ্চিৎ স্থান মিলে যদি।
শুনি নবাব দিলে ডাক—
তড়িতে মুন্সী পত্রী লেখ।
কিঞ্চিৎ স্থান পাত্রবরে
যেন চৌধুরী কৃপা করে।
তথিরে খুদি জলাশয
পাত্র তাঙ্কর কীর্ত্তি চায।
লেখি লেখন অনুচরে
দ্রুত ছাড়হ গুমগড়ে।

মুন্সী তা লেখি উত্তম
সম্ভ্রমে দেলা শিরোনাম।
লেখন ঘেনি দূতজনে
অর্পণ কলে ত ঙ্ক স্থানে।
সে পত্র পাই সসম্ভ্রমে
চৌধুরী শিরে তুলি চুমে।
পঠই হই হর্ষ যুত
লিখে জবাব মনঃপুত।
নফরে চাহি কৃপাদান
লাঞ্ছিত কলে প্রভু মান।
আপন দান আপনে দেব
আপত্তি কি মোর থিব।
দেউছি হর্ষ অনুরাগে
স্থান যা তাঙ্কর মনে লাগে।
আপন তাঙ্কে কর দান
মোর বাড়া যে মান্য মান।
এমতে চৌধুরী উত্তরে
দূত ফিরিলা হিজলীরে।
উত্তর পাই মহাপাত্র
কলে গ্রহণ গ্রাম মাত্র।
খুদাই তথি জলাশয
নামরে রখে পরিচয।
বাকী স্থানরে গরীব জনে
দেইলে বসবাস কারণে।
আপন জাতি করণ আউ
আসে উৎকল দ্বিজ যেউ।
গ্রামের নাস শমসাবাদ
থুলে রটাই মনসাধ।
দেওয়ানচক আর গ্রাম
ভীমসেন কীর্ত্তি অবিরাম।
মহাপাত্র নাম জলাশয়
নিত্য স্মরণ বহি থায়।
ব্রজগোপাল তৎপব
প্রজা পালই নিরন্তর।
ভুযো দান ধান যে কলা
স্থানরে স্থানরে দেইলা।
মন্দির মসজিদ গড়ি—
বিদ্যাদানরে চৌপাড়ী।
সম্পদ অকাতব ব্যয়ে
নিত্য ধর্মকর্ম যে সাধয়ে।
ঘোষিলা যশঃ মান তার
রাজ আখ্যান উপহার।
দেশর যত প্রজা মিলি
ঘোষই কণ্ঠরে তা বলি।
বষঃ প্রাপ্তরে কাল গ্রামে
চলি যে গলে স্বর্গধামে।
তা সুত নন্দী গোপাল
রাজ্যে হইলে প্রজাপাল।
তিন খণ্ডরে গুমগড়ে
তিন স্থানরে গড় গড়ে।
আপন নামে নন্দীগ্রাম
দ্বিতীয় গড় রাণী নাম।
লগ্নামণি সে ভেটুরাতে
কালী স্থানই তৃতীয়েতে।
গড়িলে গড় কালী নামে
সে যে ঘোলপুকুর গ্রামে।
এমন্তে তিন গড় গড়ি
পুষই বহু কর্মচারী।

দুর্গ গড়িলে বাস ভুঁয়ে
চৌপাশে কামান গাড়িয়ে
কৃষ্ণপ্রসাদ পুত্রে তার
চালনে দেলে সৈন্যভার।
ময়ূরপঙ্খী জলযান
গড়ন কৈলে পঞ্চখান।
ভাসাযে তাকু গঙ্গা জলে
দমন কলে মগ দলে।
অশ্ব পৃষ্ঠরে সদা চড়ি
গড বক্ষউ অষ্ট ঘড়ি।
এমন্তে বিক্রম তাঙ্ক—
শত্রু গণিথা যমশঙ্ক।
বুড়া হই নন্দী গোপাল
পুত্রে বরিলা রাজ্যপাল।
সেকালে জঙ্গরে বর্গীদল
ঘেরি করই দেশ দখল।
প্রজামানকু ঘর লুঠি
করই অরাজ বিঘ্ন সৃষ্টি।
অগ্নি জ্বালাই শস্য ক্ষেতে
পুড়াই চলে চারি ভিতে।
প্রজামানকু ধরি ধরি
গুরই খাজানা কড়ি।
দেই ন পারে যেই জন
তাহাকু মকামে লেইন।
বাঁধি শীতর রাত্রিকালে
বসায়ে থুই গলা জলে।
মাথারে দেই ভিজা খড়
শাসয়ে মারি ডাঙ্গ চড়।
গ্রীষ্মকালে খরারে থুই
এমন্তে বর্গী তশীল করই।
দেশ উজাড় ক্রমে ক্রমে
চাষী ন চষে চাষ ভুঁযে।
বন জঙ্গল মধ্যে লুকাই
ডরে ডরে কাল অটই।
খসি পড়ই গর্ভিনীর
অকালে গর্ভ শিশু তার।
জলদস্যুর ভয়ঙ্কর
তা বাড়া বর্গী অত্যাচার।
পুরাণ কালে পরশুরাম
নিঃক্ষত্র কলা ধরাধাম।
তেমন্তে বর্গী দল শুন
দেশ করিলে জনহীন।
পুড়ায়ে আউ গড়বাড়ী
রাজাকু কৈলে ভিখারী।
রাজা কাঁদে বাতুল সম
সর্বদা মন উচাটন।
শেষর কালে বর্গী ঠাঁই
মনর দুঃখ সবু কহি।
শরণ যাচি কর যুড়ি
রক্ষ বলই ঘড়ি ঘড়ি।
দয়া জাগিলা বর্গী চিতে
আশ্বাস দেলা হেনমতে।
দ্বাদশ লক্ষ কান কড়ি
দিলে চলিব রাজ্য ছাড়ি।
কড়ি ন দিলে পাবু সাজা
প্রকাশে হাসি বর্গী রাজা।
দ্বাদশ লক্ষ কা'ন কড়ি
রাজা যে দিলে ত্বরা করি।

লইয়া বর্গী ছাড়ে দেশ
রাজার ফুটয়ে নিঃশ্বাস ।
প্রজামানকু ডাক ছাড়ি
কহে দেশকু আস ফিরি ।
চাষবাস কর হর্ষ চিত্তে
মকুব বকয়া খাজনা যেতে ।
সকলজনে পাইব তা
ন রাখ মনরে চিনতা ।
সকল শঙ্কা ত্যজি আইস
যার যে ঢিপারে বাঁধ বাস ।
ফৌত ফেরার না রব কেউ
আনিবু নয়া আসিবে যেউ ।
খোরাকী লাঙ্গল বীজধান
বলদ সকল কিনি আন ।
যাহার যা লাগে আনিবু
সকল অর্থ মো পাশে লবু ।
বিনা সুদরে দবু আসল
কিস্তিরে পঞ্চ বর্ষ কাল ।
এমন্তে কৃষ্ণ প্রসাদ
বিলই মুক্ত করে সম্পদ ।
নিখোঁজ হই যে যেথা থিলা
পুন সে ফিরি দেশে আইলা ।
এমন্তে প্রজাপালি পালি
রাজার কোষ হৈলা খালি ।
দুরভিক্ষ মকড় সঙ্গ
রাজ্যে যুড়িলা মৃত্যুরঙ্গ ।
ক্রমরে দৈন্য হইলা দেশ
বাকী যে পড়ই রাজস্ব ।
দুঃখ ক্ষোভরে রাজমন
সদা গ্রাসিলা দিন দিন ।
কৃষ্ণ প্রসাদ চিন্তাভারে
চলি গলই পর পারে ।
কুমার দুর্গাপ্রসাদ
ঋণ শৃঙ্খলে বন্দীকৃত ।
পাইয়া ঋণ রাজ্য যে
প্রমাদ গণে মন মাঝে ।
পিত্রঙ্ক বন্ধু শুকলাল
সেকালে রাজা মৈষাদল ।
দুর্গাপ্রসাদ তার ঠাঁই
খত লিখই ঋণ লই ।
তহিঁরে নহিলে নিঃশেষ
বাকী যে নবাব রাজস্ব ।
দিনকু দিন ঋণ বাড়ে
যেমন্তে সে অশ্ব দৌড়ে ।
চিন্তা অনলে পুড়ে মন
কান্তি কামিলা দিনক্ষণ ।
অন্ন জল ক্ষুধা তিরিষা
ছাড়ই ঘুম নেত্র বাসা ।
এমন্তে দুর্গাপ্রসাদ যে
ঋণ জ্বালারে নিত্য মজে ।
গ্রাসিলা অশুভ কাল
গত যে রাজা শুকলাল ।
আন্দীলাল সে মৈষাদলে
রাজা হইলা হেনকালে ।
আঁখিরে হেরি ঋণ লেখ্য
পাশরি গলে সবু সখ্য ।
উসুল চাহি পুনঃ পুন
নালিশ দিলা যত ঋণ ।

নবাব সরকার হেরই
লাট বন্দী কিস্তি ন মিটই ।
বহুত বাকী চৌধুরী পাশ
আদায়র নাহি তিল আশ ।
ডিক্রি দেইলে তা জমীদারী
আন্দীলাল লইব কাড়ি ।
দুর্গাপ্রসাদ হইব দীন
এ নহে উচিত বিধান ।
মনরে চিন্তি সরকার
হুসরে লিখে বায তায ।
ঋণ রাজস্ব যাহা বাকী
সবু একরে খুড়ি লেখি ।
ডিক্রি লিখই ঠিকমত
ক্ষতি ন করি কার কিঞ্চিৎ ।
আন্দী লাল আজি হইতে
ঋণ পাইব কিস্তি মতে ।
দুর্গা প্রসাদ জমীদারী
গুমগড় তশীল করি ।
তাঙ্করে দেবু মাসহারা
উচিত মতে ন হেব ফেরা ।
অগ্ররে সরকারী বাকী
শুধিব পিছে ঋণ রাখি ।
এমন্তে যেতে বর্ষ লাগিব
তা ঋণ নিঃশেষে লইব ।
অন্তে চৌধুরী জমীদারী
তা হস্তে যাইব ফিরি ।
লইযা ডিক্রি রায় হেন
কর্তক হই তোষমন ।

আন্দীলাল তশীল তরে
পাঠাই দেলে নায়েবেরে ।
তেরপাইক নায়েব সাথে
ছাউনি গড়েই বয়ালেতে ।
দুর্গাপ্রসাদ উগ্রা হই
দ্রুত সঙ্গরে পাইক লই ।
নায়ব শির খণ্ডকলা
গড় ছাড়িয়া গোপ হেলা ।
মৈষাদলকু অধিকারে
শরণ লৈলে কাজলাগড়ে ।
রাজাকু যাচি সৈন্যদল
বলে বান্ধব দেহ কোল ।
বার্ত্তা পাই যে আন্দীলাল
রুষি ছাড়ই সৈন্যদল ।
নবাব সরকারে প্রার্থই
ফৌজ আনয়ে বহুতই ।
কামান বন্দুক ভরা নৌকা
হেলে হাজির লই রেজাখাঁ ।
হলদী নদীতটে উঠই
চক্রবেড়িয়া গড় ঘেরই ।
রক্ষী পাইক অল্প থিলা
সংবাদ শুনি লুকাইলা ।
রাণী শুনই হেন বার্ত্তা
খিড়কি পথরে যাউথা ।
দাসদাসী গড়ে থিলী যেতে
কুল দেবী সে বাসুলী সাথে ।
ডিঙ্গারে সবে চড়ই
নদী কূলে কূলে চলই ।

হলদী মুখে ঘোর বনে
উঠই সবে তুঙ্গ স্থানে।
কামান গর্জ্জন শুনই—
মেঘ-কোণে অগ্নি জ্বলই।
গড় পুড়ুছি হউছি দিশা
সীমন্তে শরবণ দশা।
বিষাদে রাণী ছাড়ে শ্বাস
কৈলে বিচার থির বিশ্বাস।
ধবা পড়িলে যবন হাত
হইব কুলশীল নিপাত।
স্মরণে রাণী উঠয়ে কাঁপি
গঙ্গা জলরে পড়ে ঝাপি।
অতলে ডুবিলা কলেবর
নিখোঁজ নিশানা তাঙ্কর।
এধারে ফৌজ ছাউনী হেরি
পিছরে গলে কাজলা ডরি।
বোলই বন্ধু ন তিল আশ
জিনি কি পারিব নবাব রোষ।
সৈন্য কামান যা আছে
অতি অলপ নবাব কাছে।
ক্ষম বান্ধব আশাবাণী
ফিরি গলে গড়কু পুনি।
শুনি চৌধুরী নিরাশ মন
ক্ষোভে করিলা আত্মগোপন।
মিলিলে মারাঠা থানে যাই
পটাশপুরে কাজলা ছাড়ই।
বর্গী পণ্ডিত বলই বন্ধু
শঙ্কা ন রাখ চিত্তরে বিন্দু।

নবাব ফৌজ বর্গী হাতারে
শমনসম গণই ডরে।
এমন্ত আশ্বাস বিশ্বাসে
চৌধুরী রৈলে বর্গী বাসে।
গত হইলে কতেক দিন
রাজ্য চিন্তারে চিত্ত মলিন।
করিবাকু হৃত রাজ্যোদ্ধার
কিছি ন কৈলে বর্গী সর্দার।
নিত্য যাচি যাচি কৃপাকণি
নিন্দি আপন ভাগ্য ঘৃণি।
গুপ্তে ছাড়ই বর্গী ডেরা
মুর্শিদাবাদ গলে ত্বরা।
সবু আপন দোষ স্বীকারি
কহে ভো নবাব দণ্ডধারী।
ক্ষমহ অনুগত জনে
মু অপরাধী তু চরণে।
নবাব শুনি সত্যভাষ
ন দেই প্রাণ দণ্ডাদেশ।
ক্ষমি সকল দোষ তার
শাস্তি দানই অপূর্ব্বরু।
ছিনই তাঙ্কর জমীদারী
নৈলে আপন খাস করি।
দানি খান্দার প্ররগণা
ন করি সরলে বঞ্চনা।
সনদ লেপি আনন্দরে
নবাব আপনে স্বাক্ষরে।
পুছয়ে চৌধুরীরে পুন
আউ ন করিবি কর্ম্ম হেন,

চৌধুরী যুগল হস্ত করি
সত্য করয়ে ফিরি ফিবি।
প্রভু আপনে প্রাণ দাতা
সকল দত্তদান ধাতা।
সতারে বদ্ধ আজিবীন
বাক্য পালরে তব ঋণ।
শোধরে বংশ পরাম্পরে
আবদ্ধ হউছি অঙ্গীকারে।
ষোলশ তিরাশি শকাব্দবে
চৌধুবী নাম ওমগড়ে।
অন্তরে গলে যে ডুবি
যেমন্তে সন্ধ্যাকালে রবি।
তাবাই রাজ্য পবিজন
দেশান্তে হই নির্ব্বাসন।
নিত্য উঠই মনে কাঁদি
পরাণে তাহাকু বাঁধি।
মনকু পবিবোধ দিযে
থান্দাবে বাম বান্ধযে,
লক্ষ্মীবিহীন মরুস্থলী
সন্তাপ উঠে জ্বলি,

অতি অল্পর দিনগতে
চৌধুরী গলে কাল পথে।
সংবাদ পাই ওমগড়
কান্দই ঘোর নিরন্তর।
ঠাই ঠাই সকল প্রজা
মিলি করই স্মৃতি পূজা
থান্দার আন্ধার পুরী
সেথা ন পুছে কন চৌধুরী।
এমন্তে চৌধুরী কুলকীর্ত্তি
শতাব্দী মধ্যরে বিলুপ্তি।
মরণে তাহার কিঞ্চিৎ
লিখি যে চৌধুরী চরিত।
ক্ষুদ্র লেখনি লেখক দীন
সকল দোষ ক্ষম সুজন
গুরু চরণে শ্রীগোপাল
দাস দেউছি অর্ঘ্যমাল,
চৌধুরী চরিত সমাপ্তরে
শত নমই ভূমিষ্ঠে বে।
বিদায় দেহ সবজনে
দীন কবি কু নিজ গুণে

———